সমাজ ও সম্প্রদায়

কলিকাতা বংগবাসী কলেজের অধ্যাপক
ডক্টর শ্রীপ্রবোধকুমার ভৌমিক

সাহিত্য প্রকাশ ভবন
৪৪।১এ, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯

মঙ্গলাচরণ

অধ্যাপক প্রবোধকুমার ভৌমিক কয়েক বৎসর ধরিয়া শিক্ষকতা করিতেছেন। সম্প্রতি মৌলিক গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে উপাধির দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন। উপরন্তু তিনি বাঙলা ভাষার প্রতি অনুরাগশীল এবং ছাত্রবৎসল।

বর্তমান কালে শিক্ষার বিষয়ে অনেক পরিবর্তন ঘটিতেছে। মাতৃভাষার সহায়তায় উচ্চশিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ে সহজ ভাষায় পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা ক্রমে ক্রমে স্বীকৃত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় গ্রন্থকার বইখানি প্রকাশ করিয়া ভালই করিয়াছেন। পরিভাষার সম্পর্কে তাঁহাকে যথেষ্ট চিন্তা করিতে হইয়াছে। এইরূপ চেষ্টার দ্বারাই ক্রমে আমাদের ভাষা সমৃদ্ধিলাভ করিবে এবং জ্ঞানের পরিধিও বিস্তৃত হইবে।

আশা করি, সাধারণ পাঠকের নিকট পুস্তকখানি সমাদর লাভ করিবে।

নির্মলকুমার বসু
(এফ্, এন্, আই, ডিরেক্টর,
অ্যানথ্রপলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া)

৩৭এ, বোসপাড়া লেন,
কলিকাতা, ২৪ ভাদ্র, ১৮৮৩ শকাব্দ

শব্দপঞ্জী

Animist—জড়োপাসক

Association—পরিমেল, সংঘ

Bachelors' dormitory —যুবাছেলেদের আড্ডা

Bride price—কন্যাপণ

Caste—বর্ণ

Clan—কুল, গোত্র

Composite family—জটিল পরিবার

Cleaver—কুঠার

Cross cousin marriage—আত্মীয় বিবাহ

Duel organisation —দ্বৈতদলের সমাজব্যবস্থা

Endogamy—অন্তর্বিবাহ

Exogamy—বহির্বিবাহ

Family—পরিবার

Female infanticid—কন্যাহত্যা

Group marriage—যৌথবিবাহ

Group concionsness —গোষ্ঠীচেতনা

Hoe—কোদল

Institution—বিধি, সংস্কার

Junior Levirate—দেবরণ

Joint family—একান্নবর্তী বৃহৎপরিবার

Lineage—বংশ

Moiety—দ্বৈতদল

Matriarchate—মাতৃকেন্দ্রিক, মাতৃপ্রধান

Marriage by capture —রাক্ষস বা পৈশাচ বিবাহ

Marriage by mutual consent গান্ধর্ব্য বিবাহ

Marriage by elopement —পলায়নে বিবাহ

Marriage by negotiation —প্রজাপত্য বিবাহ

Parallel cousin marriage —জ্ঞাতি বিবাহ

Pastoral—পশুপালক

Phratry—ভ্রাতৃদল

Polygamy—বহুবিবাহ

Polygyny—বহুপত্নী বিবাহ

Polyandry—বহুপতি বিবাহ

Patriarchate—পিতৃপ্রধান, পিতৃকেন্দ্রিক

Promiscuity—অবাধমিলন, অজামিলন

Primary, elementary family— প্রাথমিক পরিবার

Restricted sorrorate— সীমিত শালিবরণ

Sorrorate—শালিবরণ

Taboo—ধর্মীয় নিষেধ

Totem—গোত্রদেবতা

Tribe—উপজাতি, খণ্ডজাতি

Unit—সংস্থা

সূচীপত্র

সমাজ

সম্প্রদায়

লেখকের কথা

আমার ঋণের অবধি নেই। ছাত্রজীবন থেকে বরেণ্য অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু মহাশয়ের কাছে সমাজ ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে যতকথা শুনেছি আর যত প্রত্যক্ষ করতে গেছি আমার আশপাশের প্রতিবেশী-পরিজন, সমাজ-সম্প্রদায় ততই আমার জ্ঞান। তথ্য বা সিদ্ধান্তগুলো উজ্জ্বলতায় ভরে উঠেছে। এ ঋণ সবারই কাছে যাঁরা আমায় প্রেরণা দিয়েছেন। সেই অভিজ্ঞতা মাতৃভাষায় কিছু প্রকাশ করতে চেষ্টা পেয়েছি; অভিজ্ঞাতার দুর্বলতা, প্রকাশভঙ্গীর ত্রুটি সবই একান্তভাবে আমার, একথা স্বীকার্য।

ব্যষ্টিকে ঘিরে সমষ্টি। ব্যষ্টি আর সমষ্টির সম্পর্ক, জীবনসংগ্রামের টানা-পোড়েনের কর্মকুশলতা, অভিজ্ঞতা,—সবকিছুই সংস্কৃতি, সবকিছুই সমাজ-সম্প্রদায়ের অঙ্গীভূত সাংস্কৃতিক রূপরেণু। এরই মধ্যে গতিশীল সমাজের জীবনাদর্শ, গোষ্ঠীসচেতনতা, কর্মব্যঞ্জনা নানাভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। এই সবের পারস্পরিক নিরন্তর অভিযোজনে সমাজের রূপান্তর সম্ভব হয়। এই অভিযোজন ও পরিবর্তনের বিরাম নেই,—এ হ'ল চিরন্তন।

আমাদের দেশে নৃবিজ্ঞানের প্রসারের সংগে মানুষ ও তার সংস্কৃতিকে নবরূপে প্রত্যক্ষ করার আয়োজন চলছে। সমাজ ও সংস্কৃতি হ'ল নৃবিজ্ঞানের প্রধান অঙ্গ। মানুষের ধ্যানধারণা, আশাআকাঙ্ক্ষা তার ব্যবহারিক জীবনের তরঙ্গায়িত কর্মধারা সবকিছুরই মাঝে রয়েছে চিন্ময়। জীবজগতের শ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসাবে মানুষ তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা পায়। দেশভেদে, কালভেদে কর্মোদ্যমের বিভিন্নতায় সমাজের রূপান্তর ঘটে, মানবসম্পর্কের হের-ফের হয়। নৃবিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের মন এই তারতম্যকে উপলব্ধি করার এক সংস্কার মুক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তির সমর্থন পাবে সন্দেহ নাই। যার ফলে সামাজিক, সাম্প্রদায়িক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবে। সহানুভূতি ও সহৃদয়তায় একক মানুষের দৈন্য, সামাজিক বৈষম্য ও অহেতুক মর্যাদার স্তরভেদের ঘটবে বিলুপ্তি। সারা বিশ্বের সকল মানুষ প্রাণের মধ্যে সেই ভালবাসাবন্ধনের অমিয় উৎসের সন্ধান পাবে। বিশ্বমানবতার জয় হোক!

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১ — শ্রীপ্রবোধকুমার ভৌমিক।

১২৭, লেক টাউন, কলি-২৮

টোডা সদাব

আন্দামানী যুবক

টোডা দুধ থেকে মাখন
তৈরী করছে

টোডাদেব ঘব

টোডাদেব
অভিবাদন

টোডা : মা ও সন্তান

সমাজের কাঠামো

জীবজগতের শ্রেষ্ঠ প্রাণী হইল মানুষ। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে নানা পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটে, কালক্রমে সেই মানুষের জীবন যাত্রার হেরফের ঘটিয়াছে, তাহার প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বলয় পরিবর্তিত হইয়াছে। সেইজন্য জীবন সংস্কৃতি হইল একটি গতিশীল প্রবাহের মূর্ছনা। এই মানুষকে ঘিরিয়া সমাজ। কেননা জীবের যাহা প্রয়োজন মানুষের ত তাহা থাকিবেই। সেই প্রয়োজন মিটাইবার প্রয়াসই জীবন সংগ্রামের আর এক দিক। প্রাণীমাত্রেই সুখে শান্তিতে বাঁচিতে চায়, মানুষও ঠিক তাহাই চায়। শুধু তাহা নহে, মানুষ সহযোগিতা চায়, দল বাঁধিয়া কাজ করিয়া সে ধরাপৃষ্ঠে সুখ ও শান্তির অধিকারী হইতে চায়। এমনি সুখ-দুঃখের টানা-পোড়েনে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির নানা পরিবর্তন হয়, মানুষ জীবন সংগ্রামে অভিযোজন করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। অভিজ্ঞতা, ভাষা ও সহযোগিতার মাধ্যমে দলবদ্ধভাব উত্তরাধিকার হইয়া সংস্কৃতির মর্যাদা পায়। মানুষেরই একমাত্র সুসংসবদ্ধ সমাজ আছে। সেখানে একক মানুষ গোষ্ঠী বা দলের মধ্যে, স্থায়ীভাবে নিরুপদ্রবে বাস করিবার, বা বাঁচিয়া থাকিবার এক পথ পায়, আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করিবার স্বতঃস্ফূর্ত গতিপথ আবিষ্কার করিয়া থাকে। জীবন যাত্রা সুগম করিবার অভিনব চেষ্টায় আগ্রহশীল হইয়া থাকে। স্থান ও কালভেদে সমাজের চেহারাও নানাপ্রকারের হয়।

আঞ্চলিক পরিবেশের সংগে সমতা রাখিয়া নানা ধরণের সমাজ চিত্রের উদাহরণও বিরল নয়।

নিরবচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র সমাজগোষ্ঠী হউক বা বৃহত্তর সমাজই হউক

তাহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। তাহা হইল সংঘবদ্ধতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে রূপায়িত করিবার জন্য নানা অনুশাসন, আদর্শবাদের সৃষ্টি, আত্মরক্ষা, অবাঞ্ছিত উপদ্রবকে এড়াইবার জন্য নানা বিশ্বাসের অবতারণা, মানসিক বা আবেগ প্রশমনের জন্য নানা বিধি নিষেধ, ক্রিয়াকাণ্ড বা মিলনের স্বীকৃতি ইত্যাদি। কেননা জীবমাত্রেই কতকগুলি মৌলিক সহজাত বৃত্তি (Instinct) আছে। যেমন ক্ষুধা, ক্রোধ, ভয় ও যৌনপ্রেবণা ইত্যাদি। এই সবেরই এক সুসামঞ্জস নিয়ন্ত্রণই হইল সমাজ সংস্কৃতিব গতিশীল দিক। এই সবেরই চবিতার্থতার জন্য সমাজে গঠন বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। সেইজন্য সমাজের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করিবার প্রাক্কালে আমাদের সমাজেব কাঠামো জানিতে হইবে। তাহার সহিত ব্যক্তি সম্পর্কের ধারা বা গোষ্ঠীজীবন নিয়ন্ত্রনের মূলগত শক্তির উৎস ও খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে সমাজে মানুষ দলবদ্ধ হইয়া তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার পন্থা আবিষ্কার করে, তাহার সার্থক রূপ দিবার নানা আয়োজন করে। ইহার মধ্যে ঐক্যবোধ (Feeling of unity) বা সমাজ চেতনা (Group conciousnεss) সম্ভব হয়। আবাব সমাজের বিভিন্ন অবস্থার সংগে অভিযোজন (Adaptation) হইল ব্যক্তির ধর্ম। তাহাতে সমাজের ধীর পরিবর্তন সাধিত হয়। সেইজন্য সমাজের কাঠামো ভৌগোলিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা ও বিভিন্ন সংঘাতের ঘাত প্রতিঘাতের সহিত এক নিগূঢ় সম্পর্ক রাখিয়া চলে। তাই পৃথিবীর নানা দেশের সমাজ-কাঠামোর তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন দিক

প্রত্যেক সমাজের কী আদিম সংস্কৃতি গুঞ্জরিত উপজাতি বা

খণ্ডজাতি অথবা অর্ধসভ্য আর সুসভ্য সম্প্রদায়ের হউক, প্রত্যেকর গঠন বৈচিত্র্যে কতকগুলি অন্তর্নিহিত ঐক্য রহিয়াছে। সেইগুলিকে এক কথায় সংস্থা বা ইউনিটস (Units) এবং বিধি বা সংস্কার (Institution) বলা হয়। ঠিক ঘরের কাঠামোর মত সমাজ দেহে সংস্থাগুলি বিবাজমান। ঐ ইউনিটগুলিব ধরণ কখনও বা বক্ত-সম্পর্ক, আঞ্চলিকতা, স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ, বয়সেব স্তবভেদ ইত্যাদিব উপর নির্ভর কবে। বিভিন্ন ব্যক্তি লইয়া বিভিন্ন বয়সেব লোক জন লইয়া, বিশেষ কাবণে এই ইউনিটগুলি সমাজেব নানাবকম উদ্দেশ্য সাধন করিযা থাকে। পবিবার (Family), কুল বা গোত্র (Clan), ফ্র্যাট্রি (Phratry), ময়েটি, (Moiety) হইল এই ধরণের কতক গুলি সামাজিক সংস্থা। ভাবতবর্ষে বিশেষ করিয়া হিন্দু সমাজে বর্ণ (Caste) গুলি এ ধবণেব একটি সংস্থা। আবার গ্রাম, নগর, জেলা, রাষ্ট্র হইল এক একটি ক্ষুদ্র বৃহৎ বাজনৈতিক ইউনিট। উপজাতি সমাজেব যুবা ছেলেব আড্ডা (Bachelors dormitory) অথবা আমেবিকাব আদিবাসীদেব সমব সংস্থা (Military societies) প্রভৃতি হইল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ইহাব মাধ্যমে সমাজেব লোকজন নিজদিগকে সাংস্কৃতিক প্রভাবে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পায়। এমনি-ভাবে জীবনেব নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রবৃত্তি সমূহের চবিতার্থতাব জন্য এক অনাবিল শান্তিতে বাঁচিয়া থাকিবাব জন্য নানা ধরণের দল বা সংঘবদ্ধতা সমাজে দেখা যায়। কর্মব্যপদেশে হউক বা ধর্ম ব্যপদেশে হউক একই উদ্দেশ্যেব কতিপয় লোকজন লইয়া এইবকম দল গড়িয়া উঠে। এই সমস্তগুলির আকৃতি প্রকৃতি বা আয়তন লোকজনদেব সংখ্যার উপর নির্ভব করে। দুইটি লোকের পরিবার বা হাজাব লোকের একটি গোত্র সব কিছুই জনসমষ্টির মিলনের উপর নির্ভর করে। আবার একটি ইউনিটের কর্মসূচী বা কার্যধারার সংগে অপরটির সমতা রাখা সমাজের বৈশিষ্ট্য। ইহার মাধ্যমে সামাজিক গতিপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকে।

সমাজের বাইরের শক্ত কাঠামোর সংগে তাল রাখিয়া 'বিধি',

সংস্কার (Institution) বা অনুশাসন গড়িয়া উঠে। মানবদেহের হাড়ের কাঠামোর মধ্যে যেমন করিয়া রক্ত মাংস সুসংবদ্ধ অবস্থায় গ্রথিত থাকিয়া দেহের সৌষ্ঠব সাধন করিয়া থাকে ঠিক তেমনি ভাবে সমাজের ঐ কাঠামোর সংগে বিধি, অনুশাসন বা সংস্কারগুলির অদ্ভুত সমন্বয়ে সমাজদেহের বিভিন্ন বিকাশ হয়। তাহার মধ্যে প্রতিটি মানুষের অর্থাৎ প্রতিটি সামাজিক ব্যক্তির এক পূর্ণ অভিব্যক্তি বা স্ফুরণ হয়। এইভাবে মানুষেব গড়া সমাজে মানুষ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজেব মধ্যে বিবাহ, শিক্ষা, আত্মীয়তা (Kin-sip), সম্পদ (Property), আইন, ধর্ম (Religion) হইল প্রধান বিধি। অবশ্য এইগুলির ও ইতর বিশেষ হয়। কেননা প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগোলিক আবেষ্টনী, জীবন সংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাত, দূর-নিকট সম্পর্ক ইত্যাদির উপর ঐ সব বিধি বা অনুশাসনগুলির তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

ভারতীয় সমাজ চিত্রে আমরা যেমন বিভিন্ন বর্ণ (Caste system) প্রথা দেখি তেমনি এই সবের গুণ বিচার করিলে ইহাদের সহিত অর্থনৈতিক কার্যধারার এক অদ্ভুত সমন্বয় দেখিতে পাই। এই সব বিভিন্ন বর্ণ আর্যসংস্কৃতির সংশ্লেষে গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাক্ আর্য ভারতবর্ষে যে সব আদিবাসী বা উপজাতি বাস করিত এখনও তাহাদের বহু বংশধর নানাভাবে বিভিন্ন পরিবেশে ও অর্থনৈতিক জীবন বৈচিত্র্যে বাঁচিয়া রহিয়াছে। তাহাদের সমাজ সংস্কৃতির ধারা অনুশীলন করিলে নানা বৈচিত্র্য পরিস্ফুট হইবে। উপজাতি বা খণ্ডজাতিদের মধ্যে আদিম সমাজের অনেক নিশানা দেখিতে পাওয়া যাইবে। সেই সব দেখিয়া সমাজ বিজ্ঞানী অতি সহজেই সমাজের রূপান্তর ও তাহার উপর বিভিন্ন প্রভাবের সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিবে। তাহাতে সুস্পষ্ট হইবে কিভাবে অর্থনৈতিক বা পারিপার্শ্বিক প্রভাব সমাজকে গতিশীল করিয়া তুলিয়াছে অথবা অপ্রয়োজনীয় সংস্কারগুলি ধীরে ধীরে কি ভাবে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়াছে। তাই গতিশীল

সমাজে কেবলমাত্র বর্তমান সভ্য সম্প্রদায়ের জীবন আলেখ্য জানিতে হইবে তাহা নহে আদিবাসী বা খণ্ডজাতি গুলির মন্থর জীবনপ্রবাহও অনুশীলন করিতে হইবে।

উপজাতি বা খণ্ডজাতি (Tribe) হইল একটি সামাজিক গোষ্ঠী বা সংস্থা। সাধারণত সেই দল লোক সংখ্যা অনুযায়ী ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হয়। কাডার (Kadar) উপজাতির সংখ্যা প্রায় তিনশত। পশ্চিম বাংলার উত্তরাঞ্চলের টটো (Toto) উপজাতিরা অনুরূপ। আবার বৃহত্তম সাঁওতাল বা ওরাওঁ উপজাতি রহিয়াছে। তাহারা সাধারণত আদিম উপায়ে জীবন যাত্রা নির্বাহ করে। তাহাদের ভাব প্রকাশ করিবার ভাষা মোটামুটি এক এবং প্রায় একটা বিশেষ অঞ্চল ঘিরিয়া তাহাদের বাস। তাহাদের আকৃতিগত অথবা সংস্কৃতিগত ঐক্য রহিয়াছে এবং সংঘবদ্ধতা তাহাদের আর এক বিশেষ গুণ। ইহাছাড়া তাহাদের জীবনযাত্রায় তেমন জটীলতা নাই বা কর্ম জীবনে পারদর্শীতা বা ব্যুৎপত্তি (Specialisation) নাই। তাহারা জড়োপাসক (Animist)।

দীর্ঘকালের ব্যবধানে ও নানা সমাজ সংস্কৃতির ঘাত প্রতিঘাতে উপজাতিদের সেই আদিম সংস্কৃতির অনেক রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিম বাংলার লোধা উপজাতি তাহাদের মাতৃভাষা ভুলিয়া গিয়াছে। পশ্চিম বাংলার রাজবংশী, বাগ্‌দী বা বাউড়ীদের পূর্বপুরুষ এককালে আদিবাসী গোষ্ঠী-ছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। এইভাবে মধ্য ভারতে গন্দ উপজাতির মধ্যেও নানা প্রকার সামাজিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। উপজাতি বা হিন্দু সমাজের বিভিন্ন বর্ণগুলি নিজদলে বিবাহ (Endogamous) করে, দুই একটি উপজাতি আছে যেমন আন্দামানী তাহারা অন্য উপজাতির সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া থাকে। ছোটনাগপুর অঞ্চলের মুণ্ডা উপজাতির সংগে মহালী, ওরাওঁ বা ভূমিজ উপজাতির বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে; এবং তাহাতে নূতন গোষ্ঠী বা উপদলের সৃষ্টি করিয়াছে।

ভারতীয় উপজাতির সামাজিক কাঠামো :

ভারতীয় হিন্দুসমাজের বর্ণপ্রথা বা রীতিনীতি ও সামাজিক বৈচিত্র্য বাদ দিলে উপজাতির এক বিশেষ সামাজিক রূপ ফুটিয়া উঠে। এই সব কাঠামোর কোন কোনটির সহিত বর্তমান সমাজের বিভিন্ন মানুষের গোষ্ঠীর সাদৃশ্য দেখা যায়।

প্রতি সমাজের ক্ষুদ্র দল, সংস্থা বা ইউনিট হইল পরিবার। বিবাহের পর পরিবার গড়িয়া উঠে। পুরুষ ও স্ত্রীর মিলনে মানসিক আবেগ প্রশমিত হয়। তাহাদের সম্মিলিত কার্যধারা, জীবনযাত্রা সুগম করিয়া তুলে। তাই পরিবার হইল সমাজের আদিম ক্ষুদ্র সংস্থা। এই পবিবাবেব মধ্যে ব্যক্তিজীবন বিকাশলাভ করে।

আন্দামানীদের সমাজ কাঠামোতে পরিবাবগুলি হইল প্রাথমিক সংস্থা। কয়েকটি পবিবার লইয়া একটি স্থানীয় দল (Local group) গড়িয়া উঠে।

এক একটি স্থানীয়দলে প্রায ৮।১০টি পরিবার থাকে। প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোক লইয়া স্থানীয়দল হয়। তাহাবা বৎসরের বিভিন্ন সময় নানাস্থানে ঘুবিয়া বেড়ায়। এই স্থানীয় দলই তাহাদের সমাজ পরিচিতির একমাত্র ক্ষেত্র। উড়িষ্যার পাউড়ীভূঁঞা বলিয়া যে খণ্ডজাতির সমাজ আছে তাহাদেব গঠন বিচিত্র্য অনেকটা অনুরূপ। ইহারা নিজেদের দলের বাহিবে অনেক সময় বিবাহ করিয়া থাকে। সমাজ হইল ; উপজাতি—স্থানীয়দল—পরিবাব।

আর এক ধরণের সমাজচিত্র দেখি সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ বা লোধা উপজাতিদের মধ্যে। তাহাদের সমাজে কয়েকটি কুল বা গোত্র (Clan) আছে। যেমন সাঁওতালদের বারটি। লোধাদের নয়টি। আবার সেই কুল বা গোত্রগুলি অনেক সময় ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা আকারের হইয়া থাকে। তাহাদের কৌলিক প্রথারও অনেক তারতম্য রহিয়াছে। তাহা হইলে উপজাতি—কুল বা গোত্র—পরিবার, এই হইল ইহাদের কাঠামোর স্তর।

মণিপুরের আদিম কুকি সম্প্রদায়ের আনাল (Anal)-দের সমাজ

কাঠামো ভিন্নরূপ। তাহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান দ্বৈতদল (Moiety) রহিয়াছে। ঐ দ্বৈতদল দুইটির কতকগুলি করিয়া কুল বা গোত্র রহিয়াছে। তাহাদের প্রতিটিতে কয়েকটি করিয়া পরিবার রহিয়াছে। বিবাহ সম্পর্ক বা অন্যান্য সামাজিক অনুশাসনে ইহাদের বিভিন্নতা অনুমান করা যায়। উপজাতি—দ্বৈতদল—কুল বা গোত্র—পরিবার, এই হইল ইহাদের সামাজিক গড়ন। আবার দ্বৈতদলের পরিবর্তে কয়েকটি ভ্রাতৃদল বা ফ্র্যাট্রি (Phratry) অনেক উপজাতি সমাজের বৈশিষ্ট্য। আসাম অঞ্চলের গারো বা মধ্যভারতের পাহাড়ী মারিয়া (Hill Maria) হইল ইহাদের উদাহরণ। তাহাদের ঐরূপ তিনটি দল আছে। আর এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সামাজিক কাঠামো হইল আসামের আইমল কুকিদের। কেননা তাহাদের সমাজ কাঠামোতে দুইটি প্রধান দ্বৈতদল (Moiety) রহিয়াছে। সেই দ্বৈতদল দুইটিব প্রতিটির দুইটি করিয়া ভ্রাতৃয়দল বা ফ্র্যাট্রি তে বিভক্ত। আবার প্রতিটি ফ্র্যাট্রিতে কয়েকটি করিয়া কুল বা গোত্র (Clan) এবং প্রতিটি কুলে কয়েকটি করিয়া পরিবার থাকে। ইহাদের বিবাহ সম্পর্কের ধারাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আঙ্গামী নাগাদের মধ্যেও এইরকমের কিছুটা সমাজ গঠন লক্ষ্য করা যায়।

আর এক ধরণের সমাজ গড়ন গন্দ উপজাতিদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। সেইখানে আদিবাসী বা উপজাতিসমাজ কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র খণ্ডজাতিতে বিভক্ত হইয়াছে অথচ তাহাদের সকলের এক সাংস্কৃতিক বা আকৃতিক সাদৃশ্য রহিয়াছে। সেই ক্ষুদ্র খণ্ডজাতি (Sub-tribe) গুলি অন্যগুলির সংগে বিবাহ সম্পর্ক রহিত করিয়া এক একটি পৃথক উপজাতি হিসাবে পরিগণিত হয়। আবার সেই সব ক্ষুদ্র খণ্ডজাতির মধ্যে কুল বা গোত্র রহিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে পরিবার। অনেকের মতে সড়াইকেলা অঞ্চলের ভূমিজদের সমাজ গঠনে এই রকমের আভাষ পাওয়া যায়।

আদিম কুকি গোষ্ঠীর পুরুম (Purum)-দের সমাজ গঠনে আর এক বিশেষ দিক দেখা যায়। তাহারা প্রথমে কয়েকটি বৃহৎ কুল বা

গোত্রে বিভক্ত। সেইগুলির আবার কতকগুলি করিয়া বিভাগ—উপগোত্র (Sub-clan) রহিয়াছে। পুনরায় ঐ উপগোত্রগুলি কতক-গুলি পরিবারে বিভক্ত।

এমনিভাবে সমাজের বিভিন্ন দল, উপদল বা ইউনিটগুলির মধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের বিভিন্ন কর্মধারা, ধ্যান-ধারণা, ক্রিয়াকাণ্ড বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট। সবগুলির বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যক্তিজীবন সমাজ জীবন নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ব্যক্তি বা সমষ্টি, এইগুলির সংগে সমতা রাখিয়া জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। তাহারই মধ্য দিয়া সংস্কৃতির রূপান্তর বা জন্মান্তর ঘটিতেছে।

এই সমস্ত ক্ষুদ্র-বৃহৎ ইউনিটগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কও লক্ষ্য করা যায়। ইউনিট যত ক্ষুদ্র হয় পারস্পরিক সম্পর্ক ততই গভীর হয়। উদাহরণ স্বরূপ পরিবাব (family)-এর কথা ধরা যাইতে পারে। উত্তরোত্তব আমরা যতই বিবাট ইউনিটের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ধরণ দেখিব তাহা ততই ক্ষীণ মনে হইবে। কুল বা গোত্র পরিবাব হইতে অনেক বড় ধরণের ইউনিট। অন্যায় প্রতিরোধে বিভিন্ন জাতি উপজাতিদের কুল বা গোত্রের মাধ্যমে প্রতিশোধ লইতে দেখা যায়। এই সমস্ত ইউনিট গুলি আঞ্চলিকতা অথবা রক্ত সম্পর্কতার জন্য দলবদ্ধ হয় ও সচেতন হয়। অন্দামানী বা ভেদ্দা (সিংহলের আদিবাসীগোষ্ঠী)-দের মধ্যে এই ভাবে আঞ্চলিক নৈকট্য বিশেষ প্রাধান্য পায়। কৃষিজীবী গোষ্ঠীর নিকট গ্রাম সংঘবদ্ধতার একটি বিশেষ ইউনিট হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। তখন গ্রামবাসী গ্রামের সুখসুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য সমবেত ভাবে নানা কাজ করিবার চেষ্টা পায়। পুরুষ-স্ত্রী ভেদে অনেক সংস্থা বা ইউনিট দেখা যায়। আসামের আও নাগা উপজাতির বয়সের স্তরভেদ অথবা ছোটনাগপুরের ওরাওঁ উপজাতির যুবা ছেলের আড্ডা (Bachelors dormitory) । এই পর্যায়ে পড়ে। বয়সের তারতম্যে নানা দল বা সংস্থার উদ্ভব হয়। এখনও বহু আদিবাসী সমাজে এই রকম সংস্থা বিদ্যমান।

মোটকথা সমাজের বিভিন্ন সংস্থাগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন মানুষ স্বাভাবিক ভাবে বাঁচিয়া নিজেদের সামাজিক বিকাশের পথ খুঁজিয়া পায়। নানাবিধ পরিবর্তনের সংগে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়া মানুষ তাহার অগ্রগতিকে প্রাধান্য দেয়। যেখানে তাহার সেই চেষ্টা ব্যাহত হইয়াছে সামাজিক পরিবেশ বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল হইয়াছে সেইখানেই ব্যক্তি বা সমষ্টি জীবনের ব্যর্থতা মানুষকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে লীন করিয়া দিয়াছে।

সমাজ কাঠামোর বাহিরের এই শক্ত ধরণের আবরণ (Structure) ছাড়া নানবিধি, সংস্কার বা অনুশাসন (institution)-গুলির ও ধরণ লক্ষণীয়। বিবাহ হইল এক রকম বিধি সংস্কার। যাহার মাধ্যমে স্ত্রী ও পুরুষের স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সংসার গড়িয়া উঠে, যৌথশ্রমে পরিবারের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় হয়। সমাজ বিশেষের বিবাহের ধারা, রীতিনীতি বিভিন্ন রকম হইয়া থাকে। বহু আদিবাসীসমাজে বিবাহের পূর্বে অবাধ প্রণয় ও মিলন স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। বিশেষভাবে গন্দ উপজাতি অথবা ওরাওঁদের জীবনে এ এক স্বাভাবিক রীতি। বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী-পুরুষ বিশেষে শ্রম ভেদ—দেখা যায়। বিবাহের পর স্বামী বা স্ত্রীর অবস্থান সমাজের এক বিশেষ অবস্থার ইঙ্গিত দিয়া থাকে। পিতৃপ্রধান-সমাজ (Patriarchate society) ব্যবস্থায় স্ত্রী তাহার শশুর বাড়ীতে আসে আর মাতৃ প্রধান সমাজ-ব্যবস্থা (Matriarchate society)য় স্বামী তাহার শশুর বাড়ীতে অর্থাৎ স্ত্রীর পিত্রালয়ে বাস করিতে যায়। এই ভাবে এই সমস্ত বিধি বা সামাজিক অনুশাসন সমাজ ব্যবস্থাকে প্রভাবান্বিত করে।

শৈবালে-শাদ্বলে, তৃণে, শষ্যে-শষ্পে বসুন্ধরায় প্রাণের আবির্ভাব এক আশ্চর্য ঘটনা। এককোষ বিশিষ্ট প্রাণী অ্যামিবা (Amoeba) রূপান্তরিত হইল বহুকোষ বিশিষ্ট প্রাণীতে। তাহারই ক্রমবিবর্তনের পথ ধরিয়া মানুষের আবির্ভাব পৃথিবীতে এক নূতন যুগের সূচনা করিল। মানুষের দেহের গঠনতন্ত্র লইয়া পর্যালোচনা করিলে অথবা ভূগর্ভের স্তরে স্তরে তাহাদের যে সব স্মৃতি লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহার অনুশীলন করিলে মানুষের দৈহিক ক্রমপরিবর্তনের ইতিহাস হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। সেই আদিযুগের মানুষ বাঁচিবার জন্য, নিরাপদে টিকিয়া থাকিবার জন্য কত না সংগ্রাম করিয়াছে! আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে দুর্বল মানুষের মনে দুর্বার সংগ্রামের প্রেরণা দিয়াছে তাহার বুদ্ধি ও মন। সেইজন্য সৃষ্টিশীল মানুষের মন কৃত্রিম আয়ুধ বা অস্ত্র নির্মাণ করিয়া সবল হইয়া প্রকৃতি ও প্রাণীর উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

মানুষের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে তাহার পরিবেশ ও প্রকৃতির কথা সর্বাগ্রে চিন্তা করা প্রয়োজন। উল্লেখ যে ঐ সময় পৃথিবীর আকৃতি ছিল অন্যরূপ—দীর্ঘ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া তুষার বা হিমের রাজত্ব চলিয়াছিল। প্রকৃতির ভয়াল পরিবেশের কাছে মানুষ ছিল নিতান্ত অসহায়। কিন্তু সেই মানুষ যখন শক্ত একটি প্রস্তর বা উপলখণ্ডকে (Pebble) নিজের প্রয়োজনে লাগাইতে আরম্ভ করিল তখনই তাহার জীবনে পরিবর্তন আসিল। সেই সব আদি যুগের প্রস্তরের বিভিন্ন আয়ুধ বা যন্ত্রপাতি পৃথিবীর নানাস্থান হইতে বিশেষ করিয়া ভূগর্ভের স্তর হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার কোনটা হাত কুঠার (Hand axe),

তাহারও আবার আকৃতিগত তারতম্য আছে—কোনটা ডিম্বাকৃতি, (Ovate) কোনটা বা বাদাম (Peariform) এর মত। সেই আদিম প্রস্তরযুগে আরও কিছু গাছকাটা কুঠার (Cleaver); ছুরিকা (Knife) বা স্ক্রেপার (Scraper) আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই প্রাগঐতিহাসিক যুগে মানুষ ছিল শিকারী। তাহাদের ছিল গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন। কেননা সকলে মিলিয়া বাহির না হইলে শিকার করা কঠিন হইত। আবার শিকারে কোন নিশ্চয়তা ছিল না। ফলে শিকারে আহৃত দ্রব্যসামগ্রী সকলে মিলিয়া বণ্টন করিয়া খাইত। শিকারীদের একস্থান হইতে অন্যস্থানে পরিভ্রমণ করিতে হইত। সেইজন্য এই খাদ্য অন্বেষণকারী গোষ্ঠীগুলিকে যাযাবর (Nomadic) এর মত ঘুরিতে হইত। ফলে তাহাদের কোন স্থায়ী বাসস্থান ছিল না। আর ঐ সমাজে বৃদ্ধ বা পঙ্গুদের অথবা শিশুদের তেমন যত্ন লওয়া হইত না। ইহাছাড়া ভক্ষ বস্তুর অপ্রাচুর্যও অনিশ্চয়তাহেতু তাহারা অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিত এবং বেশিদিন বাঁচিয়া থাকা তাহাদের অদৃষ্টে ঘটিত না। এই যুগে স্ত্রীপুরুষের কোন স্থায়ী সম্পর্ক ছিল না। সমাজে প্রকৃতপক্ষে পরিবার বা কুল বা গোত্র প্রভৃতি সংস্থা এমন কি বিবাহ প্রভৃতি বিধি বর্তমানের মত রূপপরিগ্রহ করে নাই। বরং সবকিছু যেন আলগা বন্ধনহীন বলিয়া মনে হইত।

পরের যুগে, বিশেষ করিয়া নিয়ান্‌ডারথ্যাল (Neanderthal man) বলিয়া অর্ধমানবের বংশধরের সময়ে মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তীর, ধনুক, বর্শা প্রভৃতি আয়ুধের ব্যবহার, অগ্নির প্রজ্জ্বলন ঐ সময় হইতে পাওয়া যায়। অগ্নির আবিষ্কারে মানুষের অনেক সুখ সুবিধা বাড়িল। তাহার দ্বারা সে শীত হইতে রক্ষা পাইল। অন্ধকারের বিভীষিকা হইতে বাঁচিল, কাঁচামাংস ঝল্‌সাইয়া বা পুড়াইয়া খাইতে আরম্ভ করিল। ঐ যুগে আবহাওয়াও একটু উষ্ণভাবাপন্ন ছিল। শীতের সময় তাহারা পশুচর্মের গাত্রাবরণ প্রস্তুত করিত। অধিক শীতের

প্রকোপে অবশ্য মানুষ গুহাবাসী হইয়াছিল। এই পরিবর্তিত পরিবেশে সমাজেরও রূপ অন্যরকম হইয়াছিল। শিকারের বহু ফন্দী তাহারা আবিষ্কার করিল। তখন দলগুলি এক একটি খণ্ডজাতিতে রূপান্তরিত হইয়া নির্দিষ্ট এক ভূখণ্ডে বাস করিতে লাগিল। তাহারা দলের বৃদ্ধদের সম্মান দিতে শিখিল। কেন না তাহাদের অভিজ্ঞতা, শিকারের বিভিন্ন ফন্দী বা কলা কৌশল ধীরে ধীরে সংস্কৃতির উত্তরাধিকার হইয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে এক একটি খণ্ডজাতি কোন বিশেষ অঞ্চলের সংগে বা আঞ্চলিক জীবজন্তু বা বৃক্ষাদির সংগে জড়িত করিয়া নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করিত। এই পরিচয় ছিল তাহাদের কৌলিক পরিচয়ের মত। এক একটি গাছপালা বা প্রাণীকে তাহারা তাহাদের টোটেম (Totem) বা গোত্রদেবতা বলিয়া মনে করিত। এইভাবে বিভিন্ন গোত্রের বা কুলের উদ্ভব ঘটে। কৌলিক বা টোটেম-সমাজে বিবাহ নিয়ন্ত্রণ (Regulated marriage) হইতে আবম্ভ করে। ইহার পূর্বে সমাজে অবাধ মিলন (Promiscuity) প্রচলিত ছিল। বৃদ্ধেরা সামাজিক রীতিনীতি সৃষ্টির প্রয়াসী হইল—নিজেরা নানাবিধ সলা পরামর্শ করিয়া থাকিত। এখনও আন্দামানী উপজাতির সমাজে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

তাহারপর পৃথিবীর পরিবেশ পরিবর্তিত হইল। হিমযুগ বা তুষার যুগের অবসান হেতু তাহা গলিয়া বিশাল জলরাশির সৃষ্টি করিল। সেই জলে পর্যাপ্ত পরিমাণে জলচর প্রাণী, ঝিনুক, গুগ্‌লি, মাছ, প্রভৃতি জন্মিল। মানুষের জীবিকা আরও জটিল হইল। সেইসব জলচর প্রাণীদের তাহারা স্বল্পায়াসে নিজেদের উদরপূর্তির জন্য ভক্ষণ করিতে লাগিল। ঐসব কাজের সুবিধার জন্য ছোট ছোট 'ক্ষুদে অস্ত্র' (Microliths) তৈয়ার করিয়াছিল। ঐ অস্ত্রগুলিকে এখনও একসংগে বাঁধিয়া 'করাত' বা 'কাস্তে' তৈয়ার করিয়া বনজ নীবার বা শষ্য আহরণ করিত। মাছ মারিবার জন্য

হারপুণ (Harpoon) বা বর্শা নির্মিত হইত। প্রচুর পরিমাণে আহার্যবস্তু পাওয়া যাইত বলিয়া তাহাদের খাদ্যান্বেষণের জন্য আর ঘোরাফেরা করিতে হইত না। বাড়ীর মেয়েদের ফলমূল আহরণ অথবা গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজ করিতে হইত। থাকিবার' জন্য কুটির বা আবাসস্থল বা গ্রাম গড়িয়া উঠিল। পাথরের মসৃনফলকের দ্বারা কোদালি (Hoe) অথবা গাছের বাঁকা ডাল দিয়া 'হল' বা 'লাঙল' তৈয়ারী হইল এই যুগেব বৈশিষ্ট্য। পশুপালন ঐ যুগেব প্রাধান্য লাভ করে। খুব সম্ভব কুকুরই প্রথম গৃহপালিত প্রাণী। ধীরে ধীরে মেয়েরা মাটির বাসনকোষণ তৈয়ারীর কাজে মন দেয়। ইহার সংগে সংগে চলিল সুতাকাটা ও বস্ত্রবয়ন এইভাবে মানুষ নূতনভাবে স্থায়ী হইয়া বসবাস আরম্ভ করিল। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হইল। সমাজের প্রথমস্তরে সন্তানসন্ততিরা তাহাদের মায়েদের নামে আত্মপরিচয় প্রদান করিত। নারীদের হাতে একপ্রকার কর্তৃত্ব ছিল। তাই এই যুগের সমাজ ব্যবস্থাকে মাতৃপ্রধান (Matriarchate) সমাজ ব্যবস্থা বলা হয়। বর্তমানেব আসামের খাসিয়া বা গাবো উপজাতিদের মধ্যে এই ধরণের মাতৃপ্রাধান্যের নিদর্শন মিলে। এইরকম সমাজ ব্যবস্থায় সকলে মিলিয়া উৎপাদন করিত। উৎপাদন ব্যবস্থা ধীরে ধীরে জটিল হইতে আরম্ভ করিল - ফলে নানারকমের অস্ত্র, দ্রব্যসম্ভার বা আয়ুধ নির্মাণ হইতে আরম্ভ করে। এইসব নির্মাণের জন্য শ্রম-বিভাগের তফাৎ ঘটিল, ফলে ব্যক্তিসম্পর্কের ধারাও পরিবর্তিত হইল। বিভিন্ন কাযধারায় সমাজের প্রতিটি মানুষ নিযুক্ত হইতে লাগিল। আহার্যবস্তুর প্রাচুর্য ঘটিল—জীবনে নিরাপত্তা আসিল। ধীরে ধীরে আসিল ব্যবসা ও বাণিজ্য। এক অঞ্চলের দ্রব্য সামগ্রী অন্য অঞ্চলে যাইত সেখানের চাহিদা মিটিত, অতিরিক্ত দ্রব্য অন্য অঞ্চলে ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে চলিয়া যাইত। যৌথ প্রথায় বিনিময় হইত। পশুপালক গোষ্ঠীদের বিনিময় বেশী প্রয়োজন। যেমন দক্ষিণ ভারতের টোডা উপজাতিরা মহিষ প্রতিপালন করিয়া

জীবিকা অর্জন করে। তাহারা কৃষিকার্য জানে না। প্রতিবেশী 'বাদাগা'দের নিকট হইতে খাদ্যবস্তু ও 'কোটা'দের নিকট হইতে অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী বিনিময় প্রথায় সংগ্রহ করিয়া থাকে। আলমোড়া অঞ্চলের 'ভোট'রা ও এইভাবে বিনিময় করিয়া জীবন-যাত্রার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া থাকে। পশুপালক (Pastoral) গোষ্ঠীতে পুরুষের প্রাধান্য বেশী থাকে। কেন না শক্ত শক্ত কাজ সবই ত পুরুষকে করিতে হয়।

উৎপাদন ব্যবস্থার জটিলতার সংগে সংগে সমাজে জটিল পবিবেশ হইল। কৃষিকার্যের জন্য মানুষ গহন অরণ্য কাটিয়া পরিষ্কাব করিল—প্রস্তুত হইল কৃষিক্ষেত্র। সেই কৃষিক্ষেত্রের আবার উৎপাদিকা শক্তির তারতম্য রহিয়াছে। গ্রামের সকলের ভাগে সমান জুটিবার কথা নহে। ফলে ধীরে ধীরে ধনবৈষম্য দেখা দিল। সমাজের ভিতর নানারকম বৈষম্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। ধাতুর আবিষ্কারে আরও যখন উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল তখন সমাজে স্তর ভেদ হইল। ধনীরা গরীবদের শোষণ করিতে লাগিল। মানুষের সাধাবণ বিচাববুদ্ধি এক বিশেষ রীতিনীতি মাফিক হইল। তাহার ফলে সমবণ্টন বা সহানুভূতি যাহা আদিম সমাজে এক বিশেষ গুণ বলিয়া গণ্য হইত তাহা একেবারে কমিয়া গেল। গ্রাম সমাজের কাঠামো ও সেইভাবে পবিবর্তিত হইল।

এই অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পটভূমিকায় মানুষের সমাজের রূপান্তর ঘটিয়াছে। দলবদ্ধ মানুষ ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা কুলে বিভক্ত হইয়া টোটেম বা গোত্রদেবতার সংগে নিজদিগকে পরিচিত করিয়াছে। তখন সমাজে অবাধ মিলন থাকায় নির্দিষ্ট পিতা ছিল না এবং পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত ছিল। মাতাকে কেন্দ্র করিয়া সমাজ, যেহেতু মাতা সন্তানকে লালন পালন করিয়া বড় করিয়া তুলে। সেই মাতৃপ্রধান সমাজ ব্যবস্থা নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়া বর্তমানের পিতৃপ্রধান সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের কোরাভা (Korava) সম্প্রদায়ের মধ্যে এক রকমের

অদ্ভুত প্রথা আছে যাহাতে সন্তান প্রসবের পর মাতা বাহিরে যায় ও পিতা নবজাতকের কাছে মাতার মত বসিয়া থাকে। এই সাময়িক অনুষ্ঠানকে 'পুরুষ-মাতা' (Male mother) বা কুভেড (Couvade) বলা হয়। এইরকম বহু রীতিনীতিকে আদিম সমাজের স্মারকরীতি (Survival trait) বলিয়া অনুমান করা হয় এবং তাহাতে সমাজের ক্রমবিবর্তনের আভাষ পাওয়া যায়। ঠিক তেমনিভাবে টোডা ও তিব্বতীদের বহুপতি-বিবাহ, এস্কিমো সম্প্রদায়ের নিজ স্ত্রীকে অতিথিদের সেবায় অর্পণ করা ইত্যাদি রীতি অবাধ মিলনের স্মাবকরীতি বলিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকে। অবাধ মিলনের পব যৌথ বিবাহ (Group marriage) সমাজে প্রাধান্য পায়। ঐ যৌথ বিবাহে সন্তানসন্ততিরা গোষ্ঠীর বলিয়া গণ্য হইত। তাহারা নিশ্চয়ই একই আখ্যায় পিতাদের অথবা মাতাদের সম্বোধন করিত। এখনও এইরকম কোন সমাজ ব্যবস্থা নাই। অনেক অনগ্রসর উপজাতি-সমাজে একই সম্বোধনসূচক আখ্যায় বহুলোককে অভিহিত করিতে দেখা যায়। তাহার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে হয়ত সকলের একই রকম সামাজিক মর্যাদা বা দায়ীত্ব ছিল। সেইজন্য একই আখ্যায় সকলকে ডাকা হয়। এইগুলিকে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার স্মারকরীতি বলা হয়। তাহার পরে ধীরে ধীরে সমাজে যুগল পরিবার (Pairing family) এর উদ্ভব হইয়াছে। স্থান ও কালভেদে এই সকল সমাজের ব্যতিক্রম ও ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

ভারতীয় হিন্দু সমাজের রূপান্তর

গ্রামীন ভারতবর্ষে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ছিল শক্ত। সনাতন হিন্দুধর্মে বর্ণ-বৈষম্য এক কৌলিক বৃত্তি (Occupational guild)-তে রূপ লইয়াছিল। তাহাতে নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষ নির্দিষ্ট কাজ করিয়া সমাজের প্রত্যেক লোকের সংগে বা বিভিন্ন বর্ণের মানুষের সংগে তাল রাখিয়া বাঁচিয়া থাকিত। নানাবিধ

আবিষ্কারে, ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে ভারতবর্ষে যখন নানাদেশের লোকের নিত্য আনাগোনা হইতে আরম্ভ করিল তখন তাহাদের চিরাচরিত জীবনযাত্রার ছেদ আসিল। কর্ম প্রসারের সংগে নূতন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে মানুষ কৌলিক জীবিকা পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। এইভাবে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের হাতে নূতনভাবে অর্থাগম হইতে লাগিল ও আদিম বর্ণাশ্রম বা কৌলিক বৃত্তির বুনিয়াদ একেবারে ভাঙিয়া পড়িল।

যে সব জাতি উপজাতিরা অরণ্যের নিভৃত অঞ্চলে, সভ্য মানুষের দৃষ্টির অগোচরে বাস করিত তাহাদের সমাজ জীবনে বা অর্থনৈতিক জীবনে নানা পরিবর্তনের স্রোত আসিল। যে সব আদিবাসী তাহাদের জন্মস্থানের আশেপাশে বিচরণ করিত তাহারা বিভিন্ন কাজে স্বীয় পরিবেশ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। তাহাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ও সামাজিক কাঠামো দ্রুত পরিবর্তিত হইতে লাগিল। ফলে বহু খণ্ডজাতি বা আদিবাসী নিজদিগকে হিন্দুসমাজের এক বর্ণ বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন কি কচ্ছপ (Tortoise) গোষ্ঠীর (Clan) কোন উপজাতি নিজদিগকে কাশ্যপ (হিন্দুমুনির নামে গোত্র) নামে পরিচয় দিতেছে। নিম্নবর্ণের লোকজন যাহারা দীর্ঘদিন অবজ্ঞা বা অবহেলা পাইয়াছিল. তাহারা নানারকম সৎকর্মের দ্বারা কখনও বা নিজদিগের পদবী পরিত্যাগ করিয়া উচ্চবর্ণের সাথে এক হইবার চেষ্টায় উৎসাহিত হইতেছে। যাহারা উচ্চবর্ণের তাহাদিগের অনেকের মধ্যে বিশ্বজনীন ভাবের দরুন বর্ণভেদ বা বৈষম্য ধীরে ধীরে ম্লান হইতেছে। ফলে অসবর্ণ বিবাহ, বারোয়ারী বা সার্বজনীনন উৎসব সমাজে প্রাধান্য পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সমাজে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি প্রাদেশিকতা বা জাতীয়তার উর্দ্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিতেছেন—সর্বদেশের, সর্বকালের, সর্বস্তরের মানুষ এক।

সমাজে ব্যক্তি জীবনের স্ফুরনের জন্য অথবা ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য যে সব ক্ষুদ্র বৃহৎ সংস্থা বা ইউনিট আছে পরিবার (Family) হইল একমাত্র প্রাথমিক পর্যায়েব সংস্থা। দাম্পত্য বা বিবাহিত জীবনের সুরুতে পরিবারের পত্তন হয়। কেননা পুরুষ ও স্ত্রী পরস্পরের নিকটে আসিয়া থাকে এবং স্থায়ী ভাবে থাকিয়া পারস্পরিক সাহচর্যে এক সুখের সংসার গড়িয়া তুলে। সেইজন্য পরিবারকে সমাজের একটি ক্ষুদ্রতম ইউনিট হিসাবে গন্য করা হইয়া থাকে। ধীরে ধীরে পরিবারের বিভিন্ন লোকজনদের মধ্যে স্নেহের বন্ধন গড়িয়া উঠে, একের সহিত অন্যের সম্পর্ক বা দৈনন্দিন জীবনের বোঝাপড়া বা কর্মপদ্ধতি অত্যন্ত নিয়ম মাফিক হয়, সেইজন্য এক পূর্ণ নিশ্চয়তার মধ্যে পরিবারিক গণ্ডীতে মানুষের বিকাশ হওয়া অত্যন্ত সমীচীন।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে পিতামাতা ও সন্তানসন্ততির গোষ্ঠীকে পরিবার বলা হইয়া থাকে। এই ধরণের ক্ষুদ্র পরিবারকে প্রাথমিক (Primary or elementary or simple) পরিবার বলা হয়। পরিবারে স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক নিগূঢ় হয় এবং এই দাম্পত্য (Biological) মিলনের জন্যই সন্তান সন্ততি বৃদ্ধি পায়। ফলে দেখা যাইতেছে পরিবারের পরিজনদের মধ্যে নিকট রক্ত সম্বন্ধ থাকে। অনেক সময় এই ধরণের ক্ষুদ্র প্রাথমিক পরিবারে বৃদ্ধ পিতামাতা অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতিও থাকে।

কেবল দাম্পত্য সম্পর্ক ছাড়াও পারিবারিক সংস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না এমন নহে। দক্ষিণ ভারতে নীলগিরি পাহাড় টোডা উপজাতির বাস। তাহাদের মধ্যে বহুপতি (Polyandry) বিবাহ

একটি সামাজিক বিধান। সেই সমস্ত পরিবারে সন্তানসন্ততিদের সহিত সকল পিতার রক্ত সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং এই সব পরিবারে বিভিন্ন রক্ত সম্পর্কের লোকজন রহিয়াছে। আবার আন্দামানী সমাজে পোষ্যপুত্র রাখা আর একটি প্রচলিত রীতি। পোষ্যপুত্রের সংগে সামাজিক সম্পর্ক বা বন্ধন থাকিতে পারে কিন্তু রক্ত সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়। অথচ তাহারা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়। এইভাবে পরিবারের ধরণ ও কিছুটা পৃথক হইতে পারে। এই সকল প্রাথমিক পরিবারগুলির আকৃতি অনেক সময় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যখন স্বামী একাধিক স্ত্রী লইয়া আসে অথবা একজন স্ত্রীর অনেক স্বামী জুটিয়া যায়। এই সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইতেছে।

পরিবারের ধরণ (Types)

পরিবারের পরিজন বর্গের সম্পর্ক দেখিয়া পরিবারগুলির প্রকারভেদ লক্ষ্য করা হয়। প্রথমতঃ এক বিবাহের প্রাথমিক পবিবার (Simple monogamous family)। এই সকল পরিবারে স্বামী স্ত্রী ও তাহাদের অবিবাহিত পুত্র কন্যারা থাকে। এক বিবাহে (Monogamy)-র ভিত্তিতে এই পরিবার গড়িয়া ওঠে। এই ধরণের ক্ষুদ্র পরিবার আন্দামানী উপজাতিদের মধ্যে দেখা যায়। ছোটনাগপুরের বিরহড় (Birhor) -দের মধ্যেও এই প্রাথমিক পরিবারের আধিক্য বেশী। আসাম অঞ্চলের আও (Ao) নাগা বা আঙ্গামী (Angami) নাগাদের মধ্যেও এই ধরণের পরিবার পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিমবাংলার লোধা উপজাতিদের মধ্যেও এই রকম ক্ষুদ্র পরিবারও খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। লোধাদের ৩৬৮টি. মোট পরিবারের মধ্যে ২৪৫টি এই রকম ক্ষুদ্র পরিবার অর্থাৎ ৬·৬৫% পরিমাণ পরিবার লক্ষ্য করা গিয়াছে। কোলহান অঞ্চলের হো উপজাতির মধ্যে ২৫৭টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৬৩% প্রাথমিক ক্ষুদ্র পরিবার ও তাহাদের

সহিত একাধিক পরিজন সহ প্রায় ২৩% পরিমাণ এই রকম পরিবার লক্ষ্য করা গিয়াছে।

মাতৃকেন্দ্রিক (Matrilineal) অথবা পিতৃকেন্দ্রিক (Partilineal) সমাজ ব্যবস্থার তারতম্যে পরিবারের পরিজন (Member) দের ক্রিয়া কাণ্ডের বা আচরণের ধরণ পৃথক হয়।

উল্লিখিত উদাহরণগুলিতে পিতৃকোন্দ্রক সমাজ ব্যবস্থার সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে আর আসামের গারো অথবা খাসিয়া উপজাতির মধ্যে মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার ক্ষুদ্র পরিবারের উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে। অনেক সময় পরিজনবর্গের মৃত্যুতে অথবা সংসারে সন্তানসন্ততি না হইলে পরিবার ক্ষীণ হইয়া পড়ে অথবা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এইরূপ উদাহরণও বিরল নয়। এই কথা সর্বতোভাবে স্বীকার্য যে অতি আদিম সাম্যাবস্থাতে অর্থাৎ মানুষ যখন খাদ্য সংগ্রহ (Foodgather) করিয়া এই পৃথিবীতে বসবাস করিতে সুরু করিল তখন হইতে এই ধরণের পরিবারের আভাষ মিলিতেছে। বর্তমানের সভ্য জাতিগুলির বিশেষ করিয়া বর্তমানের ইউরোপ বা আমেরিকার অধিবাসীদের মধ্যে প্রাথমিক পরিবারের উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

যে সমস্ত কৃষিজীবী উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে একান্নবর্তী পরিবার (Jonint or extended family) দেখা যাইত তাহা দিগের পারিবারিক জীবনেও ভাঙন দেখা গিয়াছে। যাহার ফলে তাহারা বিভিন্ন কর্মব্যপদেশে বাহিরে আসিতেছে ও একপ্রকার প্রাথমিক ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে থাকিতে অভ্যস্ত হইতেছে।

দ্বিতীয় প্রকারের পরিবার হইল বহু বিবাহ জনিত পরিবার (Polygamous family)। এই রকমের পরিবারের প্রকারভেদ রহিয়াছে। যেমন বহুপত্নীমূলক (Polygynous) পরিবার। এই পরিবারে একজন স্বামী থাকে ও তাহার কয়েকটি বিবাহিতা স্ত্রী থাকে। এমন হইতে পারে কয়েকজন স্ত্রী একই সংগে, একই বাসস্থানে থাকিতে পারে, অথবা প্রত্যেক স্ত্রীর পৃথক

আবাস থাকিতে পারে। যেখানে একই স্থানে সমস্ত স্ত্রী থাকে তাহাদের মধ্যে একজন প্রধানা স্ত্রী থাকে। আসাম অঞ্চলের রেঙ্গমা (Rengama) বা লোটা (Lhota) নাগাদের মধ্যেও বহুপত্নী লইয়া সংসার করিবার উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ছোটনাগপুরের আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ করিয়া ওরাওঁ, মুণ্ডা অথবা মেদিনী-পুরের সাঁওতালদের মধ্যে বহুপত্নী বিবাহের চলন রহিয়াছে। কৃষিজীবী মানুষের গোষ্ঠীর নিত্যনৈমত্তিক কাজে সহযোগিতা প্রয়োজন হয় বলিয়া এই ধরণের বিবাহ করার প্রয়োজনীয়তা থাকে। মধ্যপ্রদেশে মুরিয়া (Muria) গন্দ উপজাতির মধ্যে ২.২% পরিমাণ বহুপত্নীমূলক পরিবারের উদাহরণ মিলে। পশ্চিমবাংলার লোধা উপজাতির ৩৬৮টি পরিবারের মধ্যে ৪.৬% পরিমাণ বহুপত্নীমূলক পরিবার পাওয়া গিয়াছে।

বহুপতিমূলক পরিবার (Polyandrous family) হইল আর এক ধরণের পরিবার। এইসব পরিবারের বৈশিষ্ট্য হইল একজন স্ত্রীর অনেকগুলি করিয়া স্বামী থাকে। অনেক সময় ঐসব স্বামীরা পরস্পর ভাই হইতে পারে। তাহাদিগকে ভ্রাতৃত্বমূলক বহুপতি (Fraternal Polyandrous) পরিবার বলা যায়। হিমালয়ের পাদদেশে জানসরবেওয়ার অঞ্চলে খাসা (Khasa) উপজাতিরাই হইল তাহার উদাহরণ। নীলগিরি অঞ্চলের টোডাদের মধ্যেও ঐরকমের উদাহরণ বিরল নয়। যখন ভাইরা একই সঙ্গে থাকে তখন স্ত্রী পালা করিয়া প্রত্যেকের নিকট থাকে। আবার যখন স্বামীরা পরস্পর ভ্রাতা না হইয়া সমাজের অন্য লোক হয় তখন সেই পরিবারকে অভ্রাতৃত্বমূলক বহুপতি (Non-fraternal Polyandrous) পরিবার বলা যায়। তিব্বতীদের অথবা টোডাদের মধ্যেও এই উদাহরণ পাওয়া যায়। এইরকম পরিবারে স্ত্রী পালা করিয়া প্রত্যেক স্বামীর বাড়ীতে কিছুদিন কাটাইয়া আসে। তাহাদের দাম্পত্যজীবনে কোন প্রকার ঈর্ষা নাই বলিলেই চলে। ইহাছাড়া দক্ষিণ ভারতের নায়ার (Nair)দের মধ্যে আর একরকমের

বহুপতি বা বহু ভর্তৃকার উদাহরণ লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য নায়ারদের বিবাহ ও সংসার দুই অন্যরকম। একজন নায়ার পুরুষ কিছু দক্ষিণা লইয়া বিবাহ করে। আনুষ্ঠানিকভাবে সে কন্যার গলায় একটি সোনার পাত বাঁধিয়া দেয়। তাহার তিনদিন পরে সে স্ত্রী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কোন প্রয়োজন না হইলে ফিরিবার লক্ষণ থাকে না। ঐ সময় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নানা লোক অথবা নাম্বুদিরি বংশীয় ব্রাহ্মণগণ ঐ নায়ার স্ত্রীর সংসারে আসিয়া থাকে। তাহাদের ঐ সংসারের দায়িত্ব বহন করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে মেয়েটি তাহার ভাইয়ের সংসারে নিজের পুত্রকন্যা লইয়া দিন কাটায় মাত্র।

এই ধরণের বহুপতিমূলক পরিবারের আরও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। অষ্ট্রেলীয় ডিইরী (Deiri) উপজাতির মধ্যে আর এক প্রকার পরিবারের সামাজিক অনুমোদন রহিয়াছে। প্রথমতঃ কোন ব্যক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে যে বিবাহ করিয়া থাকে তাহাকে টিপ্পা-মালকু (Tippamalku) বিবাহ বলে। ইহা স্থায়ী বিবাহ। ইহা ছাড়া স্বামীর অনুপস্থিতে কয়েকজন পুরুষ যাহার যখন সুবিধা হয়, আসিয়া ঐ স্ত্রীর নিকট থাকিয়া পারিবারিক সমূহ কার্য চালাইয়া যায়। এইধরণের কয়েকজন নির্দিষ্ট পুরুষ কয়েকটি পরিবারের টিপ্পামালকু স্ত্রীর সহিত বসবাস করিবার সামাজিক অনুমোদন পায়। সেই সমস্ত ব্যক্তিদের পিরাউরু (Pirrauru) বা অস্থায়ী স্বামী বলিয়া গণ্য করা হয়। তাহারা স্থায়ী স্বামীর মত সংসারের সমূহ দায়িত্ব সাময়িকভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। এমন হইতে পারে যে কোন অস্থায়ী স্বামীর নিজ বাসগৃহে স্থায়ী স্ত্রী বা টিপ্পামালকু-পত্নী থাকিতে পারে। এইভাবে জটিল (Composite) পরিবারের সৃষ্টি হয়।

ঠিক তেমনিভাবে মার্কুসিয়ান (মার্কুসিয় দ্বীপের অধিবাসী)দের মধ্যেও জটিল পরিবারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মার্কুসিয় সমাজে নিজ বিবাহিত পত্নীদের সংগে কাজকর্মের সুবিধার জন্য ভৃত্য বা

সমাজের অভ্যন্তরের লোক জনদের সহজভাবে মিলনের অনুমোদন করা হয়। তাহাতে গৃহস্বামীর পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়া থাকে ও বাহিরের দিক দিয়া পরিবারের গড়নে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। এইরকম বহু বিধান অনেক উপজাতি সমাজের বৈশিষ্ট্য।

পুনরায় দক্ষিণ ভারতীয় টোডাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। প্রথমেই বলা হইয়াছে টোডা সমাজে বহুপতি বিবাহ প্রচলিত। বহুপতি বিবাহের প্রধান কারণ সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যার তারতম্য। বর্তমানে সরকারী আইনে তাহারা শিশুকন্যাকে হত্যা করিতে পারে না বলিয়া নারীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহা হইলে কী হইবে। তাহাদের সাংস্কৃতিক জীবনে বহুপতি বিবাহের সংস্কার এত বদ্ধমূল যে কিছুতেই তাহার বাহিরে চিন্তা করিতে পারে না। ফলে কয়েকজন পুরুষ একই সঙ্গে কয়েকজন নারীকে বিবাহ করিতেছে। তাহা অনেকটা যৌথ বিবাহের মত। এক কথায় কতকগুলি বহুপতি পরিবারের সমন্বয় (Compound family) বলিয়া মনে হয়।

একান্নবর্তী বর্ধিত পরিবার (Joint or extended family): আপাতদৃষ্টিতে এই পরিবারে পরিজনদের সম্পর্ক ও লোকসংখ্যা দেখিলে বেশ বিরাট বলিয়া মনে হয় এবং তাহার মধ্যে যেন কতকগুলি ক্ষুদ্র প্রাথমিক (Elementary) পরিবার রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশের একান্নবর্তী পরিবারের কথা ধরা যাইতে পারে। তাহার একজন মালিক বা কর্তা থাকে। তাহার বিবাহিত পুত্রেরা অথবা পৌত্র প্রপৌত্ররা একই বাসস্থানের মধ্যে একই অন্নের মধ্যে বর্ধিত হইয়া থাকে। অবশ্য বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে কর্তা ইচ্ছা করিলে গৃহিণী অথবা উপযুক্ত পুত্রদের সংগে আলোচনাও করিতে পারে। ওরাও, হো, মুণ্ডা, সাঁওতালদের মধ্যে এই ধরণের পরিবারের উদাহরণ বিরল নয়। আসামের লাখের (Lakher)দের মধ্যে পিতামাতার সংসারে বিবাহিত পুত্র পৌত্র না হওয়া পর্যন্ত থাকিতে

পারে। আবার আসামের খাসিয়া (Khasia) উপজাতি মাতৃপ্রধান জন্য মাতামহীর সংসারে বিবাহিতা কন্যা প্রভাবের তাহাদের অবিবাহিত পুত্র ও বিবাহিতা কন্যাদের লইয়া বসবাস করে।

পরিবারের বিভিন্ন দিক (Functions of family)

ব্যক্তি লইয়া পরিবার আবার পরিবার লইয়া সমাজ। পৃথিবীতে এমন কোন সমাজ নাই যাহাতে পরিবার নাই। অসংখ্য গ্রন্থির মত পরিবার, ব্যক্তি ও সমষ্টিকে বিভিন্ন সম্পর্কসূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সেইজন্য পরিবারের মধ্যে নানা সম্পর্কের ধারা দেখিতে পাই।

মানুষের যৌনাবেগ পরিবারের দাম্পত্য জীবনে তাহা প্রশমিত হইবার এক সুসংবদ্ধ উপায় খুঁজিয়া পায়। সেইজন্য পরিবার হইল স্ত্রী পুরুষের মিলনের এক স্থায়ী উপায়। স্থায়ী হইবার প্রচেষ্টায় মানুষের সংসার সাজাইতে হয়। সেইজন্য স্বাভাবিক ভাবে ব্যক্তি সম্পর্ক বা কার্যক্রমের নানা ধরণ পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া ঘটিতে থাকে।

অর্থ নৈতিক দিক : একেবারে শিকারজীবী অরণ্যবাসী যাযাবর গোষ্ঠী আন্দামানীদের কথা ধরিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে এক সাহচর্যে তাহাদের সংসার জীবন কাটিতেছে। স্ত্রীকে ফলমূল সংগ্রহে অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারিবারিক কার্যে এবং পুরুষদের দূরপাল্লার শিকারে বা সাহসিকতার মৎস্যশিকারে যাইতে হইতেছে। ঠিক তেমনিভাবে সাঁওতাল পুরুষেরা দূরের সমূহ কাজকর্ম করিতেছে, আর নারীরা সাংসারিক কাজকর্মের সংগে সম্ভাব্য কৃষিকর্ম করিতেছে। বালক বালিকারাও বাদ যায় নাই। তাহারা যে যেমন পারে পিতামাতাকে নানাভাবে সাহায্য করিতেছে। বর্তমান সমাজেও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এইসব কাজের মাধ্যমে পারিবারিক জীবনে যেমন অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে তেমনি তাহাদের সম্পত্তির উপর অধিকার সুচিত হয়। পরিবারের

পরিজনদের মধ্যে ঐসব স্থায়ী সম্পত্তির বিভাগও দেখা যায়। মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়। তাহার পর সম্পত্তি কন্যারা পাইয়া থাকে। ঠিক তেমনিভাবে পিতৃকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পিতার পর পুত্রই সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইয়া থাকে। দৈহিক গঠন ও সামর্থের উপর আমরা স্ত্রীপুরুষের শ্রমের বিভাগ (Division of labour) দেখিতে পাই।

নিরাপত্তা হইল পারিবারিক জীবনে আর এক বিশেষ সংস্কৃতি। মাতা যেমন নিজ স্নেহ ও মমতায় সন্তানকে সমস্ত বাধা বিপদ হইতে মুক্ত রাখিয়া ভাবী কালের উপযুক্ত করিতে চায় তেমনিভাবে পরিবারে বিভিন্ন লোকজন তাহাদের অন্তর্ভুক্ত লোকজনদের সর্বপ্রকার বিপদ বা বাধা হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা পায়। শিশুরা যেমন শৈশবে বাঁচিবার সুযোগ পায় তেমনি বৃদ্ধেরাও তাহাদের অক্ষম অবস্থায়ও নিরুপদ্রবে পরিবারের লোকজনের উপর একান্তভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। অবশ্য জুলুকাফির বা প্রাচীন ফিজিয়ানরা বৃদ্ধদের সামাজিক সংস্কারে ধরাধাম হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। তাহাতে তাহার পারলৌকিক গতি হয় এই হইল এই প্রথার অন্তর্নিহিত অর্থ।

সামাজিকতা

সন্তান সন্ততিকে উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে মানুষ করিয়া তোলা পরিবারের আর একটা বিশেষ দিক। মানুষ যেমন ভাবে পারিবারিক জীবনে এক সামাজিক স্বীকৃতি পায় তেমনি উপযুক্ত শিক্ষা রীতিনীতি, আদব-কায়দা আয়ত্তে আনাও আর একটি প্রয়োজনীয় দিক। আদিবাসী সমাজে পরিবারের গণ্ডীর বাইরেও নানা প্রতিষ্ঠান যেমন 'যুবা ছেলের নৈশাবাশ' (Bachelor's dormitory) অথবা নানা রকম সমিতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ঠিক বর্তমান সমাজের বিদ্যায়তন বা শিক্ষা কেন্দ্রের মত। শুধু সামাজিকতা নয় ধর্ম-নীতি বলিতে গেলে মানুষ জীবনের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়েই প্রত্যেক সমাজের সংস্কৃতির আবরণে শিক্ষা দেওয়াই হইল পরিবারের বিশেষ কাজ।

পারিবারিক জীবনে ব্যক্তি সম্পর্কের ধারা

ব্যক্তি সম্পর্কের কথা আলোচনা করিতে গেলে স্বভাবত স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন দিক ভাবিতে হয়। প্রথমত সাংসারিক পরিবেশে তাহাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যবহারিক জীবনের কার্যবিধিব তারতম্য হইয়া থাকে। স্বামীকে কঠিন কাজ করিতে হয় আর স্ত্রী তাহাকে সাহায্য করেন। দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মধ্যেও অন্যান্য বিষয় আসিয়া পড়ে। আদিবাসী সমাজে সন্তানসন্ততি না হইলে স্ত্রীর অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। যাহার ফলে অনেক সমাজে স্ত্রীকে নানাবিধ কঠোর শাস্তি দিয়া থাকে। আফ্রিকার উপজাতিদেব যেখানে অর্থ দিয়া বিবাহ করিতে হয় সেখানে পত্নী বন্ধ্যা হইলে তাহার উপর অত্যাচার করিয়া থাকে, আবশ্যক হইলে তাহাকে পরিত্যাগও করে। কোন সময় তাহার শ্বশুরের পরিবার হইতে পত্নীর পরিবর্তে অন্য কন্যা চাহিয়া বসে। পত্নী অসতী হইলে গারোরা পঞ্চায়েতের সম্মুখে তাহার কানের বালা ছিঁড়িয়া দেয়। আনুগত্য বিবাহিত জীবনের এক প্রয়োজনীয় গুণ। এসব সত্বেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রেমের ভাব এক সাধারণ নিয়ম।

সন্তানসন্ততি ও তাহাদের মাতাপিতার মধ্যে ও প্রগাঢ় ভালবাসা ও মায়ামমতা দেখা যায়। সর্বদেশের সর্বস্তরের লোকজনদের মধ্যে শিশুর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ এক মানবীয় বৈশিষ্ট্য। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সন্তান সন্ততির সহিত সম্পর্কের ধারা পরিবর্তিত হইতে থাকে। কখনও বা বালকদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হয়। আবার তাহাদের দীক্ষা (Initiation) হইয়া গেলে হয়ত মাতার সহিত সম্পর্কের রূপান্তর ঘটে। ঠিক তেমন করিয়া বালিকারা যখন শৈশব উত্তীর্ণ হইয়া যায় তাহাদের অন্য নজরে দেখা হয়। তখন মাতা তাহাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখে। অবশ্য পিতৃকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় সংসারের সমস্ত বিষয়ে পুরুষদের দায়িত্ব থাকে। কিন্তু মাতৃকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় পিতার সামাজিক মর্যাদা প্রাধান্য

পায় না। তখন মাতুলই পরিবার পরিচালনায় তাহার ভগিনীকে সাহায্য করিয়া থাকে। আবার মাতৃকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা না হইলে মাতুলের কর্তৃত্ব ও লক্ষ্য করা যায়। সেই সমাজব্যবস্থাকে মাতুলকর্তৃত্ব (Avunculate) সমাজ বলা হইয়া থাকে।

খাসিয়া পরিবারের বৈশিষ্ট্য

আসামের খাসিয়া উপজাতি মাতৃকেন্দ্রিক। তাহারা মাতার পদবী, নাম ও গোত্র দ্বারা নিজদিগকে পরিচিত করিয়া থাকে। খাসিয়া পরিবার মাতাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে। বিবাহিতা কন্যাও অবিবাহিত পুত্রগণ থাকিতে পারে। বিবাহের পর—পুত্রকে তাহার স্ত্রীর পিত্রালয়ে (Residence) চলিয়া যাইতে হয়। সম্পত্তির উত্তরাধিকার মাতার পর তাহার কন্যারা পাইয়া থাকে। সমাজের বিশেষ বিশেষ ধর্মাচরণে অথবা ক্রিয়াকাণ্ডে নারীদের অগ্রাধিকার রহিয়াছে। কর্মজীবনে ও শ্রমের বিভাগ রহিয়াছে। পুরুষদের কৃষিকার্য আর নারীদের গৃহস্থালীর সহিত কুটিরশিল্প-বিশেষভাবে বস্ত্রবুনা ইত্যাদি।

ওরাওঁ পরিবারের বৈশিষ্ট্য

খাসিয়াদের মত ওরাওঁরা ছোটনাগপুর অঞ্চলের এক কৃষিজীবী মানুষের গোষ্ঠী। কিন্তু তাহারের সমাজ পিতৃকেন্দ্রিক। সন্তান-সন্ততি পিতার পদবী ও কুল পাইয়া থাকে। পঞ্চায়েৎ বা অন্যান্য বিষয়ে পুরুষেরা প্রাধান্য পায়। বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর বাড়ীতে আসে। এক একটি পরিবারে পিতামাতা ও তাহার বিবাহিত পুত্র ও অবিবাহিত কন্যারা থাকে। ধর্মানুচরণেও অন্যান্য ক্রিয়াকাণ্ডে পুরুষের অগ্রাধিকার স্বীকার্য। বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার পিতার পর পুত্ররা পাইয়া থাকে।

পরিবারের উদ্ভব

মানুষ সমাজে কী ভবে পরিবারের উদ্ভব হইল এই লইয়া অনেকে ভিন্নমত পোষণ করিয়া থাকেন। জীবজগতের ক্রম-

বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে আদিম মানবগোষ্ঠী এক প্রকার যূথবদ্ধ অবস্থায় বাস করিত। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তাহারা অবাধ মেলা মেশা করিত। তখন পরিবারের উদ্ভব হয় নাই। তখনকার যে পরিবারের কল্পনা আমরা করিয়া থাকি তাহা একটি বৃহত্তর গোষ্ঠী —পরিবারের মত। যাহাই হউক না কেন, পরিবারের মূলে আমরা কতকগুলি বিশেষ কারণ অনুমান করিতে পারি। যৌনাবেগ, পারিবারিক বন্ধনে মাতার স্নেহ ও মমতা এবং পিতার যত্ন। এই তিনটি কারণে মানুষ্যপরিবার স্থায়ী হয় এবং মানুষের সমাজ চলিয়া আসিতেছে। মানুষ অথবা ইতর প্রাণীদের জীবনধারা পর্যালোচনা করিলে আমরা জীবের কতক-গুলি আদিম সহজাত প্রবৃত্তির অনুসন্ধান পাই। সেই সমস্ত সহজাত প্রবৃত্তি কী পরিমাণে পরিবার গঠনে তাহাদের উত্তরাধিকারী মানুষকে প্রেরণা দিয়াছে তাহাই বিচারের বিষয়। বনমানুষ বা শিম্পাঞ্জীজাতীয় উচ্চতর লাঙ্গুলবিহীন প্রাণীদের ও যুগল (Pairing) অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। সুতরাং দাম্পত্য সুখের লালসায় তাহারা মিলিত হয় সন্দেহ নাই। এবং ইহাও লক্ষ্য করা গিয়াছে স্ত্রী-শিম্পাঞ্জী তাহার শাবককে অনেকদিন পর্যন্ত অতিশয় যত্নে, মায়া মমতায় বড় করিবার চেষ্টা পায়। তাহার পরে শাবক বড় হইয়া তাহাদের পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া সাথী জুটাইয়া লয়। ইহা অপেক্ষা আরও অধস্তন প্রাণীদের বিশেষ করিয়া বাঘ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতির বেলায় দেখা যায়,—পুরুষ ও স্ত্রী সবসময়ে একত্রে থাকে না। নির্দিষ্ট সময়ে তাহারা একত্রে থাকে। আর তাহাদের শাবকগুলি মাতার যত্নে লালিত পালিত হয়। উহাদের জীবনে পিতার কোন আকর্ষণ বা প্রভাব থাকেনা। ইহার চাইতে আরও নিকৃষ্ট, বিশেষ করিয়া অ্যামিবা (Amoeba), হাইড্রা প্রভৃতি জীবের বেলায় স্ত্রীপুরুষ কোন ভেদাভেদ থাকে না। তাহারা নিজেদের দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বংশ বিস্তার করিয়া থাকে। সুতরাং আমরা যত উন্নত প্রাণীদের জীবন ইতিহাস চিন্তা

করিব ততই দেখিতে পাইব যে ধীরে ধীরে স্ত্রী ও পুরুষ স্থায়ীভাবে থাকিয়া, ভাবী বংশধরকে আদর ও যত্ন দিয়া পরিবেশের মধ্যে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা পাইতেছে। মানুষের বেলায় ও সেই তিনটি আদিম সহজাত প্রবৃত্তি সদা জাগ্রত রহিয়াছে বরং তাহারা বুদ্ধি ও বিবেচনার উত্তরাধিকার, শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকার লইয়া পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে।

পরিবারের রূপান্তর

পিতৃপ্রধান অথবা মাতৃপ্রধান পরিবারে নানারকম পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। বিশেষ ভাবে উপজাতি সমাজগোষ্ঠীর জীবনে যে অর্থনৈতিক চাপ আসিয়াছে তাহাতে তাহারা তাহাদের চিরন্তন পরিবেশ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতে বাধ্য হইয়াছে। ঠিক তেমনি ভাবে ভারতবর্ষের সনাতন বর্ণপ্রথা, কৌলিক বৃত্তি আর মানুষকে আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না। সেই জন্য সর্বত্র পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতেছে। দেশে শিল্প প্রসারের জন্য বা সাধারণ উন্নতির জন্য মানুষে মানুষে সম্পর্কের হেরফের হইতেছে। ইহা পারিবারিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। এই পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে পরিবারের মত ক্ষুদ্র সংস্থা ধীরে ধীরে সমন্বয় সাধন করিতেছে। অতি প্রাচীন দিনের যে গোষ্ঠীবদ্ধ অবাধমিলনের পরিবার একদিন ভাঙিয়া ক্ষুদ্র ও পরিবর্তিত হইয়াছিল। আবার কৃষিকার্যের সংগে সংগে মানুষের মধ্যে কখন বহু বিবাহের মাধ্যমে পরিবারের প্রসারের চেষ্টা হইয়াছিল যাহা এখনও কৃষিজীবী উপজাতিদের জীবনে বাস্তবে রূপায়িত হইয়া রহিয়াছে। আবার জীবনসংগ্রামে কঠোরতা আসিলে ব্যাষ্টিকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পড়িবার গরিয়া উঠিবে।

একটি সাধারণ উদাহরণ হইতে সহজেই বোঝা যাইবে কি ভাবে মানুষের পারিবারিক জীবনের রূপান্তর ঘটিতেছে। কলি-কাতার পার্শ্ববর্তী কোন শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক বা কর্মচারীদের জীবন

যাত্রা অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে তাহারা গ্রামের মানুষ। পরিবারকেন্দ্রিক গ্রাম হইতে তাহারা জীবিকার জন্য বা উন্নততর জীবনের অভিলাষে চলিয়া আসিয়া এইসব অঞ্চলে ভীড় জমাইতেছে। পরিবারের মৌলিক আদর্শ পরিজনের এক বাসস্থান : তাহা আর ইহাদের মধ্যে নাই, আবার তাহাদের সকলে স্ত্রীপুত্র লইয়া আসিতে পারে নাই,—ফলে তাহাদের পুত্রকন্যাদের নিয়মিত লক্ষ্য রাখা সম্ভব হইতেছে না। যাহারা পত্নীপুত্র আনিতে অক্ষম তাহাদেরও নৈতিক অধঃপতন ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে—তাহাদের মধ্যে আর্থিক অস্বচ্ছলতা বিদ্যমান থাকায় শরীর ও মন ধীরে ধীরে দুর্বল ও পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে। এই ভাবে ধীরে ধীরে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়া সমাজকে পঙ্গু করিয়া আনিতেছে। সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে অনুশীলন করিলে এই অসামঞ্জস্য সহজেই ধরা পড়িবে।

কুল বা গোত্র

কেবলমাত্র পরিবারের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তি পরিচিতি হয় নাই। তাহার অন্যান্য পরিচয়ের জন্য কুল বা গোত্র (Clan বা Sib) প্রত্যেক দেশের বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় কিছু না কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। এই কুল বা গোত্র হইল সম্প্রদায়, জাতি বা উপজাতির বৃহত্তম গোষ্ঠী। এই কুল বা গোত্রের মধ্যে অনেক পরিবার থাকে। সাঁওতাল উপজাতিদের কথা ধরিলে দেখা যাইবে তাহাদের সমাজ মোট ১২টি গোত্র বা কুলে বিভক্ত। এমনি ভাবে লোধা উপজাতিদেরও ৯টি গোত্র রহিয়াছে। ওরাওঁদের অনেক গোত্র আছে। 'হো' উপজাতিরা গোত্রকে 'কিলি' বলিয়া থাকে। তাহাদের সমাজে বহু গোত্র রহিয়াছে। কেবলমাত্র আন্দামানীদের কোন গোত্র নাই। ইহা ছাড়া আমেরিকায় বহু খণ্ডজাতি রহিয়াছে যাহাদের কোন গোত্রবিভাগ নাই। উড়িষ্যায় পাউড়ি-ভূঞা উপজাতিদের মধ্যেও গোত্রের বিভাগ পরিলক্ষিত হয় না। এই গোত্র বিভাগের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। গোত্রের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে সমাজের এক বিশেষ বিভাগের সংগে সংযুক্ত করিয়া তাহার পরিচিতি জ্ঞাপন করিয়া থাকে। সেই জন্য গোত্র সংযুক্তি (Affiliation) দুই রকমের হয়; পিতার গোত্রের সহিত পরিচিতি বা সংযুক্তি যাহা পিতৃপ্রধান সমাজে দেখা যায় অথবা মাতার সহিত পরিচিতি বা সংযুক্তি যাহা মাতৃপ্রধান সমাজে দেখা যায়।

গোত্রের আর একটি বিশেষ বিধান এই যে একই গোত্রের পুরুষ-স্ত্রীর মধ্যে কখনও বিবাহবন্ধন স্থাপিত হয় না। এই বিধানকে তাহারা ধর্মীয় নিষেধ (Taboo) বলিয়া চিন্তা করিয়া থাকে।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে এই কুল বা গোত্র হইল জাতি-

উপজাতির একটি বিশেষ বিভাগ। যাহার মাধ্যমে সমাজের লোকজন বিশেষ একদিকে আদি পিতা বা মাতার দিকে নিজদিগকে পরিচিত করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে ঐক্যের বা আত্মীয়তা নির্দেশক এক সাধারণ বন্ধন অনুমান করা হয়। উহার সহিত কোন পূর্বপুরুষ (Ancestor) অথবা কোন গোত্রদেবতার (Totem), অথবা কোন নির্দিষ্ট অঞ্চল বা বাসস্থান প্রভৃতির প্রত্যক্ষ বা কাল্পনিক যোগসূত্র বা সম্বন্ধ বিদ্যমান বলিয়া ধরা হয়।

যে কোন মানুষ তাহার জন্মের সংগে সংগে যে কোন একটি গোত্রের সংগে স্বাভাবিক ভাবে পরিচিত হইয়া যায় এবং আজীবন সেই গোত্রে থাকিয়া যায়। অবশ্য কোথাও কোথাও বিবাহের পব পত্নীদের গোত্র পরিবর্তিত হইয়া থাকে।

এই সমস্ত সম্বন্ধের জন্য গোত্রের লোকজনদের মধ্যে সম্বন্ধ নিগূঢ় হয়। এই সম্বন্ধের জন্যই একই গোত্রের লোক জনের মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ কল্পনা করা সমাজে অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া গণ্য করা হয়। এইভাবে সমাজে বিবাহবন্ধন স্থাপন করিবার পূর্বে প্রায় প্রত্যেকে তাহাদের গোত্র সম্বন্ধে সচেতন হইয়া থাকে।

গোত্রের লোকজনদের সংগে গোত্রদেবতার এক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ অনুমান করা হয়। এই সমস্ত গোত্রদেবতাকে কুলের লোকজন বিশেষ শ্রদ্ধা জানাইয়া থাকে।

এই গোত্র দেবতা নানাধরণের হয়। কখনও বা তাহারা জীবজন্তু, গাছপালা, অথবা খনিজ দ্রব্য এমন কি গ্রহ নক্ষত্র পর্যন্ত হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ ওরাওঁ উপজাতিদের 'কাছুয়া' অর্থাৎ কচ্ছপ গোত্র, অথবা 'লাক্রা' বা বাঘ গোত্র। যে সমস্ত লোকের কাছুয়া গোত্র তাহারা ভুলেও কচ্ছপ আহরণ করিবে না অথবা ইহা খাদ্যসামগ্রী হইলেও কোন দিন ভক্ষণ করিবে না। 'লাক্রা' বা বাঘ গোত্রের লোকেরা বাঘকেই তাহাদের প্রথম পূর্বপুরুষের বিশেষ সাহায্যকারী মনে করিয়া থাকে। ফলে বাঘের প্রতি তাহারা শ্রদ্ধা জানাইয়া থাকে। ঠিক সেইভাবে সাঁওতালদের 'হাঁসদা'

গোত্রের লোকজন হাঁস জাতীয় প্রাণীকে শ্রদ্ধা জানায় এবং তাহাকে গোত্রদেবতা মনে করিয়া থাকে। লোধা উপজাতিদের 'ভক্তা' গোত্রের লোকজন চিড়কী আলু (Yam) কে তাহাদের গোত্র দেবতা মনে করিয়া থাকে। তাহা তাহাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী হইলেও কখনও ভক্ষণ করে না। বরং কেহ যদি কোন দিন ভুলে তাহাতে আঘাত দিয়া থাকে বাড়ী আসিয়া অশৌচ পালনের মত ব্যবহৃত মাটির ভাণ্ড ইত্যাদি দূরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

এই সমস্ত সম্বন্ধ ছাড়া বিশেষ অঞ্চলের সংগে গোত্রের লোক-জনের সম্বন্ধ থাকে। মধ্য-ভারতের বাইসন মারিয়ারা বিশেষ গ্রামের সংগে নিজদিগকে পরিচিত করে, তাহা তাহাদের গোত্রের সামিল। উহাকে তাহার 'ভূম' বলিয়া অভিহিত করে। ভূমিজ অথবা মুণ্ডাগণও এইভাবে বিশেষ এক অঞ্চলের সংগে নিজদিগকে সংযুক্ত রাখিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

এই সকলের উপর ভিত্তি করিয়া কুল বা গোত্রের তিনটি বিভাগ হইতে পাবে। প্রথমত পূর্বপুরুষ সম্বন্ধমূলক (Ancestral) গোত্র। দ্বিতীয়ত এক গোত্রদেবতামূলক (Totemic) গোত্র আর এক অঞ্চল সম্বন্ধমূলক (Territorial) গোত্র।

অনেক উপজাতি সমাজে গোত্র দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। তাহাদের একটি 'বড়' আর অপরটি 'ছোট' বলিয়া পরিচিত। লোধা উপজাতির ভক্তা গোত্রের 'বড়ভক্তা' ও 'ছোটভক্তা' বলিয়া দুইটি বিভাগ আছে। বড়ভক্তার পুরুষেরা ছোটভক্তার দল হইতে বিবাহযোগ্যা কন্যা গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু ছোটভক্তাদের সহিত কিছুতেই তাহারা কন্যার বিবাহ দেয় না। এইভাবে এক একটি বড় গোত্র ধীরে ধীরে বিভক্ত হইরা যাইতেছে। ত্রইভাবে কোলহান অঞ্চলের 'হো'-দের মধ্যেও কোথাও কোথাও দ্বিধা বিভক্ত উপগোত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়।

এই গোত্র সমাজের এক বিশেষ বিভাগ হিসাবে বহু রীতি-নীতির নির্দেশ দিয়া সামাজিক কাঠামোকে প্রাণবন্ত রাখিয়াছে।

গোত্রের লোকজন আত্মীয়তা বা নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া একই গোত্রে বিবাহ করাকে গুরুতর অপরাধ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার কোন উপজাতিদের মধ্যে কোনরকমে যদি কেহ একই গোত্রে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়া থাকে তবে তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইল মৃত্যুবরণ করা। ওরাওঁ বা খাসিয়া উপজাতিরা এই রকমের গর্হিতকারীকে সমাজ হইতে চ্যুত (Excommunicated) করিয়া দেয়।

কেবল বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপনে নয় সামাজিক রীতিনীতি বা গোত্রের বিভিন্ন অনুশাসনে গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষমতা থাকে। এইভাবে অনেক উপজাতির বিশেষভাবে নাগা বা কুকি অথবা খাড়িয়া উপজাতিদের মধ্যে গোত্রের পঞ্চায়েত রহিয়াছে। এইসব পঞ্চায়েত সামাজিক বিধিনিষেধ বা ক্রিয়াকাণ্ডের অনুমোদন করিয়া থাকে। বিভিন্ন গোত্রের লোকজনদের ভিতর কলহ, বাদ-বিসম্বাদ বা অশান্তি হইলে তাহারা মীমাংসা করিয়া লইয়া থাকে।

ইহা ছাড়া গোত্রের লোকজনদের মধ্যে এক-গোষ্ঠী-সচেতনতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের রেড কাফির উপজাতির মধ্যে গোত্রবিদ্বেষ হেতু বংশানুক্রমিক কলহ ও খণ্ডযুদ্ধ বাঁধিয়া থাকে। এই সমস্ত গোষ্ঠী সচেতনতার পশ্চাতে রহিয়াছে সমষ্টিগত নিরাপত্তা। কেন না পারিবারিক জীবনে যে নিরাপত্তা সম্ভব নহে বৃহত্তর গোষ্ঠী বা গোত্রজীবনে তাহাই সম্ভব। আর সেইজন্য কোন কোন সমাজে অপরাধীকে আবিষ্কৃত করিতে না পারিলে সেই গোত্রের অন্যজনের উপর প্রতিশোধ লইবার প্রবল চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। উপজাতিদের গোত্রে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোত্রের কোথাও কোথাও নিজস্ব সম্পত্তি থাকে। খাসিয়া ও টোডা উপজাতির গোত্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকে যাহাতে তাহারা কৃষিকার্য, পশুচারণ ইত্যাদি করিয়া থাকে। এইভাবে গোত্রের আওতায় যে সম্পত্তি বা ভূখণ্ড থাকে তাহা কোন প্রকারে অন্য

গোত্রের লোকজনের নিকট হস্তান্তরিত হইতে পারে না। আমেরিকা অ্যাজটেক (Aztec)-দেরও গোত্রের সম্পত্তি আছে।

এই সমস্ত দিক ছাড়া গোত্র-দেবতার পূজা ইত্যাদির মাধ্যমে গোত্রের ধর্ম-সম্বন্ধীয় কার্যধারা বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আফ্রিকা মহাদেশের যে সমস্ত উপজাতিরা পূর্বপুরুষ পূজা করিয়া থাকে তাহারা তাহাদের মৃত পূর্বপুরুষকে ধীরে ধীরে দেবতার আসনে উন্নীত করিয়া থাকে। তাহাদের ঠিকমত পূজা, উৎসর্গ দিয়া, প্রীত করাইয়া, ভাবী বংশধরদের জন্য অখণ্ড সুখ ও নিরাপত্তা কামনা করিয়া থাকে। আমাদের দেশে খাসিয়া উপজাতিদের মধ্যেও এইধরণের গোত্রের আদিপুরুষ পূজার কল্পনা রহিয়াছে। এইভাবে গোত্রের পূর্বপুরুষদের পূজা আদিবাসী সমাজে ধর্মীয় আচরণে পরিণত হইয়াছে।

কুল বা গোত্রের উদ্ভব : অনেকের ধারণা আদিম সমাজে মানুষ দল বাঁধিয়া বাস করিত। তখন তাহাদের স্ত্রীপুরুষের কোন নির্দিষ্ট সম্পর্ক ছিল না। পরের যুগে যখন মানুষ দল বাঁধিয়া বিবাহ করিত তখন অন্য দলের স্ত্রীদের সঙ্গিনী করিত। এইভাবে সেই আদিম মানুষের গোষ্ঠীর মনে দলের বাহিরে বিবাহ করিবার চিন্তা আসে। সেই চিন্তাই গোত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে।

অনেকের বিশ্বাস আদিকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানুষের গোষ্ঠী যখন কৃষিকার্য আরম্ভ করিল তখনই তাহাদের মধ্যে গোষ্ঠীচেতনা আসিল। সেই হইতেই গোত্রের উদ্ভব হইয়াছে। অধ্যাপক লাউই (Lowie)-এর মতে পরিবারই হইল সমাজের আদিম অকৃত্রিম ক্ষুদ্র গোষ্ঠী। যেহেতু পৃথিবীর সর্বদেশের জনসমাজে পরিবারের নিদর্শন রহিয়াছে। আবার অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে গোত্রের কোন আভাষ নাই। তাঁহার অনুমান পরিবারগুলি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া গোত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। বর্তমানের সমাজ ব্যবস্থায় দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপ্তি বা গোষ্ঠীর নিরাপত্তা সরকার বা রাষ্ট্রের হাতে আসিয়াছে। কাজেই গোত্রের বিলুপ্তি

ঘটা অস্বাভাবিক নহে। কেবলমাত্র কয়েকটি সামাজিক বা ধর্মীয় আচরণে ইহা নিবদ্ধ রহিয়াছে। ক্রমে তাহাও লোপ পাইবে।

পরিবার ও গোত্রের পার্থক্যও সহজে লক্ষ্য করা যায়। প্রথমেই গোত্রের মাধ্যমে পিতা অথবা মাতার যে কোন একদিকের পরিচয়ে পরিচিত হইতে হয়। অথচ পরিবারের মাধ্যমে পিতা অথবা মাতার দুইজনের পরিচয় স্বীকৃতি লাভ করিয়া থাকে। পরিবারের মধ্যে বংশলতা (Genealogy)-র সাহায্যে বিভিন্ন পরিজনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা যাইতে পারে। কিন্তু গোত্রের লোকজন কিছুতেই কোন বংশলতার মাধ্যমে বা বংশানুক্রমিক চিত্রের দ্বারা নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। গোত্র বেশ বড়রকমের গোষ্ঠী এবং স্থায়ীও বটে। সেই তুলনায় পরিবার অনেক ক্ষুদ্র, পুত্রকন্যাদির বিবাহ ও মৃত্যুতে পরিবারের নিরশন বা বিলুপ্তি হইতে পারে।

বংশ (Lineage): অনেক সময় গোত্র বা কুল পরিবারে বিভক্ত হইবার পূর্বে অনেকগুলি বংশে (Lineage) বিভক্ত হয়। গোত্রের সহিত বংশের পার্থক্য সহজে বুঝিতে পারা যায়। কেননা গোত্রের আদি পিতার সহিত লোকজনদের যে সম্বন্ধ নির্দেশ করা হয় তাহা বেশীর ভাগ সময় কল্পনাপ্রসূত অথবা ঐ আদি পিতা কোন কাল্পনিক ব্যক্তি বা বস্তু হয়। আর বংশের আদিপুরুষ বংশধরদের সহজেই বংশ নিরূপণ করা যায়। এই বংশ একটি বৃহৎ বর্দ্ধিত পরিবার ছাড়া আর কিছুই নয়। জন্মমৃত্যুকে ঘেরিয়া যে অশৌচ, বংশের লোকজনদের তাহা মানিতে হয়। আসামের খাসিয়াদের গোত্রের মধ্যে ঐরকম বংশ রহিয়াছে তাহাকে তাহারা 'পোহ' (Kpoh) বলে। অনেক সময় বহুসমাজে গোত্র ব্যতিরেকে বংশ থাকে আবার বহু গোত্রের কোন 'বংশ'ই থাকে না। আমেরিকার মাতৃপ্রধান ইরোকেয়াদের এইরূপ বংশ রহিয়াছে। তাহারা বিভিন্ন অঞ্চল জুড়িয়া বসবাস করে। এইসব বংশগুলি বৃহত্তর' পরিবারের মত মনে হইলে কী হইবে। ইহাদের সহিত পরিবারের পার্থক্য লক্ষ্য

করা যায়। কেননা পরিবারের লোকজনদের একত্রিত থাকিবার জন্য নির্দিষ্ট আবাস প্রয়োজন, বংশের লোকজনদের ভিন্ন আবাস। বংশের যে কোন একজনের সংগে রক্তের সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়। কিন্তু পরিবারের বেলা বিভিন্ন গোত্রের বা বংশের সহিত সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়, পরিবারেরই ভাবী বংশধরদের গড়িয়া তুলিতে তাহাদের পারস্পরিক দায়িত্ব রহিয়াছে। কিন্তু বংশের লোকজনদের এই রকমের কোন দায়িত্ব নাই। ইহা ছাড়া অর্থনৈতিক জীবন-যাত্রায় পরিবারের লোকজন যেমন ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হয় বংশের লোকজনদের তেমন ঘনিষ্ঠ হইবার কোন কথা নাই।

দ্বৈতদল ও ভ্রাতৃত্বদল

একক মানুষ ধীরে ধীরে নানা সম্পর্কের বন্ধনে সমাজের বিভিন্ন বিভাগ বা গোষ্ঠীর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। এইভাবে নানারকম কাজ বা বিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষের সমাজ সাবলীলভাবে টিকিয়া রহিয়াছে। দ্বৈতদল (Moiety) হইল উপজাতি বা খণ্ড জাতি সমাজের বৃহত্তর বিভাগ। যখনই কোন উপজাতি প্রথমত দুইটি বৃহত্তরভাগে বিভক্ত হয় তাহাকে দ্বৈতদল বলা হয়। এইরকম দ্বৈতদল বিশিষ্ট সমাজ সচরাচর দেখা যায় না। মধ্য ভারতের বাস্তার অঞ্চলের মারিয়া-গন্দ উপজাতিদের সমাজে দুইটি দল দেখা যায়। আবার প্রত্যেকটি দলে কতকগুলি করিয়া গোত্র রহিয়াছে, গোত্রের মধ্যে রহিয়াছে পরিবার। এইসব দলগুলির বৈশিষ্ট্য হইল বিবাহের জন্য একদলের পুরুষকে অন্যদল হইতে কন্যা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই তাহাদের সনাতন রীতি। অর্থাৎ এই দলগুলি বর্হিবিবাহে (Exogamy)-র রীতি মানিয়া চলে। এইধরণের অনুরূপ সমাজ বৈচিত্র্য আসামের কুকি সম্প্রদায়ের আইমল (Aimal), আনাল (Anal) ও লাম্বাং (Lambang)-দের মধ্যে দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের টোডা উপজাতিদের সমাজ দুইটি ভাগে বিভক্ত, একটির নাম হইল টারথার (Tarthar), অপরটির নাম হইল টিভালিয়ল (Tivaliol), কিন্তু রহস্য এই যে দুইটি বিভাগ আবার অন্তর্বিবাহে (Endogamy)-র রীতিতে বিশ্বাসী। অর্থাৎ টারথারদের মধ্যে যে ১২টি গোত্র আছে তাহারা সগোত্রে বিবাহ করে না, কিন্তু টারথার গোষ্ঠীর বাহিরে কদাচিৎ বিবাহ করে। ঠিক তেমনিভাবে টিভালিয়লদের বেলাও তাহারা দলের বাহিরে বিবাহ করে না। তাহাদের মোট ছয়টি গোত্র আছে তাহার মধ্যেই বিবাহাদি সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

এই সমস্ত দ্বৈতদলগুলির সবসময়ে যে কোন নির্দিষ্ট নাম থাকে তাহা নহে। আনাল কুকিদের দ্বৈতদল দুইটির নাম যথাক্রমে মরচেল (Murchel) ও মরসম (Murshom), আইমলদের কোন নামই নাই। মারিয়া-গন্দ্যদের সম্বন্ধে ঐ একই কথা। সাধারণতঃ ঐ দুইটি দলের একটি অপরটি অপেক্ষা মর্যাদা সম্পন্ন (Superior) বলিয়া দাবী করিয়া থাকে।

এই দাবীর জন্য গ্রাম্য পরিচালনায় মাতব্বর, সহকারী মাতব্বর অথবা পুরোহিত সর্বদাই ঐ মর্যাদাসম্পন্ন গোষ্ঠী হইতে নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকে। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে দুইটি দ্বৈতদলের পৃথক পূজাপার্বন পৃথক স্থানে হয়। আসামের আইমল কুকিদের বেলায় প্রতিটি দ্বৈতদলের দুইটি করিয়া ভ্রাতৃয়দল (Phratry) আবার প্রতিটি ভ্রাতৃয় দলের দুইটি রিয়া গোত্র আছে।

মোট কথা এই দ্বৈত বিভাগ (Dual organisation) বিশিষ্ট হওয়ায় সমাজের কতকগুলি বিশেষ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। তখন অন্যান্য সমাজের অপেক্ষা ইহাদের বৈশিষ্ঠ্য সূচিত হয়। ভারতবর্ষের দ্বৈতদলগুলির মধ্যে মর্যাদার ইতর বিশেষ আছে। ম্যালনেশিয়ায় ঐ রকম সমাজের মধ্যে বিদ্বেষ ও হিংসাত্মক ভাব জাগরূক। মাতৃকেন্দ্রিক সমাজে পিতা যে দ্বৈতদলের হইবে পুত্র স্বাভাবিক ভাবে অন্য দ্বৈতদলের হইবে, কেননা সন্তানসন্ততি মাতার দলের সহিত সংযুক্তি সম্পর্কের দ্বারা পরিচিত হইয়া থাকে। ফলে এই সব সমাজব্যবস্থায় আত্মীয় বিবাহ বিশেষ করিয়া মাতুলকন্যা, পিতৃস্বসাকন্যা (Cross cousin marriage)-কে বিবাহ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

এই দ্বৈতসমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব লইয়া বিভিন্ন মত রহিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন ইহার দুইটি সম্ভাব্য কারণ রহিয়াছে। এমন হইতে পারে সমাজের মর্যাদা 'সম্পন্ন প্রতিষ্ঠ দলটি ধীরে ধীরে নিজেদের বিবাহ সম্পর্কের জন্য দুইটি প্রধান দলে বিভক্ত হইয়া পৃথক পৃথক ভবে পরিচিত হইবার চেষ্টায় এই রকম দুইটি

দলে বিভক্ত হইয়াছে। আবার অন্য রকমও হইতে পারে, যখন অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র গোষ্ঠী অর্থনৈতিক বা বিশেষ সামাজিক পরিবেশে দুইটি প্রধান দলে পরিণত হইয়া নিজদিগকে পরিচিত করে। মেলানেশিয়ায় এই দুইটি দল সচরাচর দুইটি বিরুদ্ধ বা বিপরীত স্থানের সংগে বা ভাবের সংগে পরিচিত করে। কেহবা স্বর্গ কেহবা পাতাল, কেহবা জল, কেহবা স্থল ইত্যাদি। যাহা হউক সমাজের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে ও বৈচিত্র্যময় জীবন সংঘাতে এইরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। গোষ্ঠীতে স্ত্রীপুরুষ সংখ্যার ন্যূনতাহেতু বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনে এই ধরণের বিভাগ তখনকার সমাজ ও মানসপরিবেশে স্বাভাবিক ছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

ভ্রাতৃয়দল (Phratry) **:** সমাজে যখন দুইটির অধিক গোষ্ঠী থাকে এবং তাহাদের মধ্যে কতকগুলি করিয়া গোত্র থাকে তবে সেই রকম বৃহত্তর দলগুলিকে ভ্রাতৃয়দল (Phratry) বলা হয়। হোপি (Hopi) উপজাতীয়দের মধ্যে বারটি বৃহত্তর বিভাগ রহিয়াছে এবং প্রতি বিভাগে কয়েকটি করিয়া গোষ্ঠী রহিয়াছে। গোষ্ঠীগুলির আত্মীয়তা সূচক সম্পর্ক হেতু তাহাদের সমন্বয় থাকা সমীচীন হয়। অনেক সময় এইসব ভ্রাতৃয়দলের নিজস্ব নাম থাকিতে পারে, কখনও স্বকীয় নাম পরিলক্ষিত হয় না। গারো উপজাতির মধ্যে তিনটি বিভাগ আছে। তাহাদের নাম যথাক্রমে মমিন (Momin), মারক (Marok) এবং সাংমা (Sangma)। এই বিভাগগুলির মধ্যে বিবাহ সম্পর্কের বিধি ও অনুসরণ করা হয়। গন্দ উপজাতির কোন গোষ্ঠীর ঐ রকম ভ্রাতৃয়দলের বিভাগ রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে পাঁচটি ভ্রাতৃয় দল আছে। সেই দলগুলির প্রত্যেকের নির্দিষ্ট ধর্ম-বিশ্বাস ও রীতি নীতি রহিয়াছে। ভ্রাতৃয়দলের গোষ্ঠীগুলি নিজ-দিগকে এক সাধারণ সম্পর্কে পরিচিত করে বলিয়া বিবাহ সম্পর্কে স্থাপনের বেলায় অন্য ভ্রাতৃয়দলের গোষ্ঠীগুলির সহিত বিবাহাদি হইয়া থাকে।

বিবাহ

পৃথিবীর প্রত্যেকটি সমাজব্যবস্থা বিবাহকে স্বীকৃতি দিয়া আসিয়াছে। শুধু তাহা নহে, মানব সভ্যতার প্রথম হইতে পুরুষস্ত্রীর স্বাভাবিক স্থায়ী মিলন লক্ষ্য করা যায়। অনেক নৃবিজ্ঞানী মনুষ্যেতর প্রাণীর বিশেষ করিয়া বনমানুষ গোষ্ঠীর যুগল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মতে স্ত্রীপুরুষের মিলনেচ্ছাই কালক্রমে সামাজিক অনুমোদন লাভ করিয়া একটি সংস্কার বা বিধান (Institution)-এ পরিণত হইয়াছে। এই মিলনেচ্ছা যখন স্ত্রীপুরুষকে স্থায়ীভাবে বন্ধন করিয়া রাখে তখন তাহা পরিবার (Family) বলিয়া গণ্য হয়। তখন পরিবারের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা, বাঁচিয়া থাকবার জন্য সংঘবদ্ধতা, সামাজিকতা, স্নেহ-মমতা প্রভৃতি বিশেষ গুণ প্রাধান্য লাভ করিয়া ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও মানব সমাজের স্থায়িত্বকে সাবলীল ও ক্রমবর্ধমান করিয়া তুলে।

সমাজ বিজ্ঞানীর মতে বিবাহ হইল একটি সামাজিক সংস্কার যাহাতে এক বা একাধিক পুরুষের সহিত এক বা একাধিক স্ত্রীর মিলন হয়, যাহা সামাজিক রীতিনীতি, লোকাচার অথবা আইনের মাধ্যমে অতি অবশ্য অনুমোদিত। আবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে, অথবা সন্তানসন্ততির মধ্যে নূতন সম্পর্ক বা কার্যধারা স্থাপিত হয়, কেবল তাহা নহে, দুইটি পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তা সূচনা করিয়া সমাজবন্ধনকে দৃঢ় করে। ইহার সংগে সংগে মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে নিরাপত্তা আসে। বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে বিবাহের ধরন ও প্রয়োজন অন্যরকম হইয়া থাকে। ধীরে ধীরে তাহা বিশদ ভাবে আলোচনা করা হইতেছে।

পুরুষ ও স্ত্রীর মিলনকে সমাজ নানাভাবে স্বীকৃতি দিয়াছে। অবশ্য

বিবাহবন্ধন ব্যতীত পুরুষ ও স্ত্রীর মিলনের ইঙ্গিত অল্প বিস্তর প্রত্যেক সমাজে রহিয়াছে। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবার পূর্বে অনেক সমাজে অবিবাহিত যুবক বা যুবতীদের অবলালাক্রমে মিশিতে দেওয়া হয়। মধ্য প্রদেশের মুরিয়া (Muria) গন্দ উপজাতির মধ্যে এই ধরনের মিলন সম্বন্ধে নানা বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের গ্রামে যুবা ছেলে-মেয়েদের আড্ডা দিবার অথবা রাত্রিবাসের স্থান আছে তাহাকে বলা হয় ঘটুল (Ghotul)। সান্ধ্য ভোজনের পর যুবকযুবতীরা ঐ ঘটুলে আসে তাহার পর তাহাদের নৃত্যগীত স্নুরু হয়। নৃত্যগীতের অবশেষে যুবক যুবতীরা তাহাদের পছন্দ অনুযায়ী সঙ্গী বাছিয়া লইয়া একত্র রাত্রিযাপন করিয়া থাকে। বিবাহের পর তাহারা আর ঘটুলে আসে না। ঠিক তেমনিভাবে ছোটনাগপুরের পার্বত্য উপজাতি ওরাওঁদের মধ্যেও বিবাহেব পূর্বে মিলনের ইঙ্গিত দেখা যায়। তাহাদের গ্রামে জোংখ্‌এড়পা (Dormitory or Dhumkuria) আছে। আর আছে নৃত্যের জন্যে মণ্ডলাকার উচ্চ আখড়া (Akhra)। তাহাদের মধ্যে ও নৃত্যগীতের মাধ্যমে সম্প্রাতি হইত, অবাধ মিলন চলিত। এই সবের মাধ্যমে ইহা নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে হইবে যে বিবাহের একমাত্র কারণ পুরুষ ও স্ত্রীর মিলন নহে। ইহার মধ্যে সামাজিক বা অর্থনৈতিক নিরাপত্তাও অতি প্রয়োজনীয় কারণ। কেননা উপজাতি সমাজে বিবাহকালীন বয়স লইয়া আলোচনা করিলে বিবাহের কারণ ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যাইবে। অর্থনৈতিক অসুবিধার জন্য কোলহানে 'হো' উপজাতির মধ্যে বহু বৃদ্ধাকে অবিবাহিতা অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। ইহা ছাড়া গারো সমাজে জামাতা শ্বশুরের মৃত্যুর পর শাশুড়ীকে বিবাহ করিয়া থাকে। কেননা গারোরা মাতৃপ্রধান উপজাতি,—বিষয় সম্পত্তির মালিক হয় নারীরা। সুতরাং সম্পত্তিতে অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে বৃদ্ধা শাশুড়ীকে বিবাহ করা তাহাদের সমাজে অসমীচীন নয়। যদি ঐ বৃদ্ধা শাশুড়ী অন্য কাহাকেও বিবাহ করিয়া থাকে তবে বিষয়সম্পত্তি হস্তান্তর হইয়া যাইবে। অতএব বয়স যে বিবাহের একমাত্র বিচার্য বিষয়

তাহা নহে। গন্দ উপজাতির মধ্যেও এই সব কারণে পিতামহের সহিত পৌত্রীর পর্য্যন্ত বিবাহ হইয়া থাকিত। টোডা উপজাতির মধ্যে আমরা বহুপতি বিবাহ (Polyandry) দেখিতে পাই। তাহাতে দেখা যায় ভ্রাতাদের বিবাহের পর কনিষ্ঠ-ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিলে সামাজিক বিধানে সেই অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকও বধূর স্বামী হইবে। আসামের কোন কোন উপজাতির মধ্যে পিতার মৃত্যুর পর বিমাতাকে বিবাহ করিবার অনুমোদন সমাজে আছে। মোটকথা বিবাহ কেবল স্ত্রীপুরুষের মিলন নহে ইহা সামাজিক বন্ধন এবং সংস্কার। ইহার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ভিত্তি, ব্যক্তিসম্পর্কের ধারা ও সামাজিক ঐক্যের পথ উন্মুক্ত হইয়া ব্যক্তিস্বীকৃতি ও ব্যক্তিত্ববিকাশ পরিস্ফুট হয়।

আচার অনুষ্ঠানের পটভূমিকা ঃ

বিবাহকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সমাজে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাহার মধ্যে প্রধান হইল চারিটি। বিবাহের রীতিনীতি ও ক্ষুদ্র লোকাচার অনুশীলন করিলে এইসব কারণ সহজেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, স্ত্রীপুরুষের মিলনের মাধ্যমে, সামাজিকতার মাধ্যমে ও প্রচারের মাধ্যমে অনুমোদন করা হইয়া থাকে।

(ক) ধর্মানুচারণ ও বিশ্বাস ঃ বিবাহের নানা রীতিনীতির মাধ্যমে অতিপ্রাকৃতিক শক্তি অথবা অশরীরী দেব-দেবীকে সাক্ষী হিসাবে ধরিয়া লওয়া হয়। হিন্দু সমাজে অগ্নি, ব্রহ্মা প্রভৃতিকে স্বাক্ষী হিসাবে কল্পনা করা হয়। লোধা উপজাতিরা 'উপরে ধরমদেবতা, নীচে বসুমাতা,' এই রকম কথা বলিয়া থাকে। বিবাহের পূর্বে গোষ্ঠীপিতা (Ancsetor)-র উদ্দেশ্যে নানা উৎসর্গ করা হইয়া থাকে। (খ) যাদু বা ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাস ঃ বিবাহবন্ধন সুখ ও শান্তিময় করিবার জন্য ডাইনী, ভূত, প্রেত বা অপদেবতার উৎপাত আশঙ্কা করিয়া নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতির বন্দোবস্ত থাকে। কোন কোন সমাজে বর ও কন্যার হাত দুইটিকে একত্রে বাঁধা হয়। তাহার অর্থ দুইজনকে এক বলিয়া ধরা, কোথাও বা বরের কাপড়ের প্রান্তদেশের সংগে কন্যার আঁচল শক্তভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

কোথাও বা বরকে কন্যার কোলে বসান হয়, তাহার অর্থ কন্যার কোল নিষ্ফলা হইবে না—সে পুত্রবতী হইবে। সিঁথিতে সিঁদুর বা লাল চিহ্নকে কেহ কেহ রক্ত দিয়া রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি বলিয়া মনে করে।

(গ) সামাজিক অনুমোদন : প্রীতিভোজ, প্রচার ইত্যাদির মাধ্যমে বিবাহ বন্ধন সমাজে স্বীকৃতি লাভ করিয়া থাকে।

(ঘ) আইনের মাধ্যমে স্বীকৃতি : বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সর্বপ্রকার বিবাহকে আইনের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিন সমাজব্যবস্থায় ভাবী স্বামী-স্ত্রী সাক্ষী সহ নিজেদের নাম দিয়া দরখাস্ত করিয়া আইনের অনুমোদন লাভ করে। আমাদের দেশে এই প্রথা ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করায় 'সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট' (Civil marriage act) অনুমোদিত হইয়াছে।

মোট কথা বিবাহবন্ধন বা সম্বন্ধ যাহাতে স্থায়ী হয় তাহার জন্য প্রত্যেক সমাজ বহু নীতি ও বিশ্বাসের অবতারণা করিয়া নিজ অবস্থার সংগে খাপ খাওইয়া লইয়াছে।

বিবাহের বিধি (Law of marrages)

পুরুষ ও স্ত্রীর মিলন স্বাভাবিকভাবে সমাজে স্বীকৃতি লাভের পূর্বে আদিম সমাজে নানা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হইত। মরগ্যান প্রমুখ সমাজ-বিজ্ঞানী মানব-ইতিহাসের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে যে রূপ পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহার দ্বারা জানা যায় পূর্বে মানুষের সমাজে পরিবার বা বিবাহ ছিল না। সমাজে অবাধ মিলন (Promiscuity) চলিত। তাহার পর ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সংগে সংগে সমাজ সম্পর্কেরও হেরফের ঘটিয়াছে। সমবর্ষীয় একদল পুরুষ একদল নারীকে বিবাহ করিত, তাহা যৌথবিবাহের (Group marriage) মত, সকলে সমানে শ্রম করিত এবং সন্তানসন্ততিরা একই আবাসে প্রতিপালিত হইত। ইহার পর যুগল পরিবার (Pairing family) অর্থাৎ একজন পুরুষ একজন স্ত্রী লইয়া বাস করিতে আরম্ভ

করিয়াছে। কিন্তু প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী মার্ডক পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজের এক ব্যাখ্যা করিয়া বলেন ২৫০টি সমাজের মধ্যে ১৯৫টি সমাজ বহুবিবাহ সমাজে অনুমোদিত প্রথা হিসাবে গণ্য করিয়া আসিতেছে। কেবলমাত্র ৪৫টি সমাজে এক বিবাহ (Monogamy) স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। যাহাই হউক না কেন বিভিন্ন সমাজ একদলকে বা নিকট আত্মীয়কে বিবাহ করা গর্হিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। বিবাহসম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পূর্বে কোন দলের মধ্য হইতে অথবা কোন দলের বাহির হইতে স্বামী বা স্ত্রী আসিবে তাহা সমাজ স্থির করিয়া লইয়াছে। এই নিরূপণ করার যে ছুইটি ধারা আছে তাহাকে বিবাহের বিধি বলা হয়। ইহা সাধারণতঃ ছুই প্রকারের। দলের মধ্যে বিবাহ বা অন্তর্বিবাহ (Endogamy), দলের বাহিরে বিবাহ বা বহির্বিবাহ (Exogamy)।

অন্তর্বিবাহ ঃ যখন কোন দল বা গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে স্থাপন করিয়া থাকে ঐ দলকে অন্তর্বিাহকারী (endogamous) বিবাহ-সম্পর্ক গোষ্ঠী বলা হইয়া থাকে। এই ধরনের বিধানেরও গণ্ডী আছে। যেমন সাঁওতালার নিজেদের মধ্যে বিবাহ করিয়া থাকে। সুতরাং সাঁওতালরা খণ্ডজাতি হিসাবে অন্তবির্বাহকারী দল। আবার সাঁওতালদের মধ্যে ১২টি গোত্র (Clan) আছে। একই গোত্রের লোকজনদের মধ্যে বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপিত হয় না—অর্থাৎ একই গোত্রের লোকজন নিজদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে মনে করিয়া বিবাহ করা অসমীচীন বলিয়া মনে করে। সুতরাং গোত্র দল (Group) হিসাবে একটি বহির্বিবাহকারী দল।

অন্তর্বিবাহ কী ভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল এই লইয়া বিভিন্ন মতামত রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন শ্রেণীগত ঘৃণা বা আভিজাত্য ইহার একটি প্রধান কারণ। অর্থনৈতিক স্তরভেদ বা মর্যাদার উপর যখন সমাজ গড়িয়া উঠে তখন একটি দল বা গোষ্ঠী অপরদলকে ঘৃণা করিয়া থাকে। সেই ঘৃণার জন্য তাহাদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। হিন্দু সমাজের কৌলিন্য প্রথা ভাবিলে আমরা ঐ কথা অনুমান করিতে পারি।

আকৃতিগত বা অবয়বগত অসাদৃশ্য : পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশে মানবগোষ্ঠীর আকৃতি বিভিন্ন হইয়াছে। কোন পিগ্‌মী (Pigmy) বা ক্ষুদ্রদেহী ব্যক্তির সংগে উচ্চদেহী নারীব বিবাহ অসাদৃশ্য। ঠিক সেইজন্য বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী বাধ্য হইয়া অবয়বগত সাদৃশ্যের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত করিয়াছে।

ধর্মমূলক বৈষম্য : কালের পরিবর্তনে বিভিন্ন আচারঅনুষ্ঠান, ধর্মীয় সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে বিভেদের উচ্চ প্রাচীর গড়িয়া তুলিল। ধর্মজীবন সমাজজীবনের অঙ্গীভূত হইল। ফলে মানুষ একই ধর্মবিশ্বাসের গণ্ডীর মধ্যে বিবাহসম্পর্ক স্থাপন করাকে যুক্তিযুক্ত মনে করিল।

রক্তের পবিত্রতা : রক্তের পবিত্রতা রক্ষার জন্য নিজ গোষ্ঠী এমন কি পরিবারের মধ্যেও বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হইতে দেখা গিয়াছে। 'হাওয়াইয়ান' (Howaian) বা 'ইনকা' (Inca)-র ভ্রাতা-ভগ্নীতে বিবাহ করিত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। সিংহলের কোন অঞ্চলে অথবা ঈজিপ্ট দেশের কুলীনরা নিজ পরিবারের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক রাখে। কেননা সাধারণের সংগে বিবাহ করিলে তাহাদের রক্তের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হইবে।

বর্হিবিবাহ (Exogamy) : যেমনভাবে অন্তর্বিবাহ সমাজে অনুমোদন লাভ করিয়াছে ঠিক তেমন ভাবে দল বা গোষ্ঠীর বাহিরে বিবাহ সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। এইসব বহির্বিবাহের নানা কারণ আছে।

ঘনিষ্ঠতা (Familiarity) : নিকট সান্নিধ্যের জন্য মানুষের মন মিলনপ্রয়াসী হয় না বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। সেইজন্য রক্তের সম্পর্ক হেতু বা পারিবারিক বন্ধনের ঘনিষ্ঠতা হেতু বিবাহ সম্পর্ক পরিহার এক স্বাভাবিক কারণ। অবশ্য অনেকেই এই মতের বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়া থাকেন।

ডুরখেয়াম প্রমুখ নৃবিজ্ঞানীর ধারণা,—গোত্রবিশিষ্ট সমাজে গোত্র-দেবতা (Totem)-র কল্পনা করা হয়। যদি সগোত্রে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হয় তবে গোত্রদেবতা অথবা পূর্বপুরুষের আত্মা ক্ষুব্ধ

হইয়া নানা বিপত্তি সৃষ্টি করিবে। পশ্চিমবাংলার লোধা উপজাতিদের মধ্যেও সেই বিশ্বাস আছে। যাহার জন্য তাহারা সগোত্র বিবাহ পছন্দ করে না। তাহাদের ধারণা সগোত্রে বিবাহ করিলে আকস্মিক মৃত্যু ঘটিবে।

অনেকের ধারণা পুরুষ বা স্ত্রীর সংখ্যার তারতম্য হেতু অন্য দল বা গোষ্ঠীর সহিত বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করা স্বাভাবিক ভাবে প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সেই জন্য গোষ্ঠীর বাহিরে বিবাহ করা সমাজ অনুমোদিত রীতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

অনেকের বিশ্বাস একই দলে বিবাহ করিলে নানা ব্যাধি সৃষ্টি হইতে পারে। সুতরাং দলের বাহিরে বিবাহ গোষ্ঠীর বা দলের উৎকর্ষ সাধনের জন্য অপরিহার্য রীতি।

বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েড বলেন,—মানুষের মনে কতক আদিম প্রবৃত্তি রহিয়াছে। সেই আদিম প্রবৃত্তির নানা বিচ্ছিন্ন প্রকাশ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কর্মধাবার মধ্যে রূপায়িত হয়। নিকট আত্মীয়ে বিবাহ অথবা অবাধমিলন মানুষের ঐরকম পশু হইতে পাওয়া সাধারণ সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু সমাজের ক্রমবিকাশের সংগে সংগে ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদের নানা তারতম্যে মানুষ তাহার ঐ উত্তরাধিকার পরিহার করিতে চেষ্টা পাইতেছে। কেননা আজ যদি তাহার মনে ঐ জান্তব প্রবৃত্তি সহজভাবে রূপ লইবার চেষ্টা পায় তবে মানুষের বহু কষ্টে গড়িয়া তোলা সমাজসংস্কৃতির বুনিয়াদ একেবারে ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। সেইজন্যে সমাজসম্পর্কের নয়া ভিত্তি সুদৃঢ় রাখিতে হইলে বহির্বিবাহ অপরিহার্য রীতি। ফ্রয়েড মানুষের এই প্রবৃত্তিকে ইডিপাস কমপ্লেক্স (Oedipus complex) বলিয়া ইডিপাসের আখানের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে মানুষের বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন ধরনের নানা আবেগ থাকে—তাহা মানুষের আদিম ও সহজাত। ফ্রয়েড তাহার এই মত সমর্থনের পশ্চাতে দুইটি যুক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এক ডারউইন সমর্থিত 'গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের বৃদ্ধাধিপাত্যের ইতিহাস' আর বরার্টসনস্মিথের পরিকল্পিত

'পূজা, পরিচর্যা ও ভোজন'। সমাজের কোন এক বিশেষ অবস্থায় বৃদ্ধরা নারীযূথকে নিজেদের অধীনে রাখিয়া স্বল্পবয়স্কদের বিতাড়িত করিয়া দিত। এই লইয়া তাহাদের মনে সংঘর্ষ, হত্যা ও পরিশেষে অনুশোচনা হইয়াছে। এই অনুশোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পূজার্চনা বা গোষ্ঠীভোজন প্রাধান্যলাভ করে। মোট কথা মানুষ নয়াসমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় রাখিতে বর্হিবিবাহকে স্বাকার করিয়া লইয়াছে।

ভারতীয় সমাজে বর্ণপ্রথা থাকায় সবর্ণে বিবাহ হয়। সবর্ণে বিবাহ না হইলে দুইরকমের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। যেমন, উচ্চবর্ণের পুরুষ নিম্নবর্ণের স্ত্রীকে বিবাহ করিলে তাহাকে অনুলোম (Hypergamy) বিবাহ বলা হয়। তাহাতে পুরুষ সমাজের মর্যাদা হারায় না বা সন্তানসন্ততিরাও মর্যাদা ঠিক রাখিতে পারে। কিন্তু যদি উচ্চবর্ণের স্ত্রী নিম্নবর্ণের পুরুষকে বিবাহ করে তাহাকে প্রতিলোম (Hypogamy) বিবাহ বলা হয়। তাহাতে কন্যা তাহার পৈত্রিক কুল বা পরিবারের মর্যাদা হইতে ভ্রষ্ট হয়।

বিবাহের প্রকারভেদ (Forms of marriage): স্বামী বা স্ত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী বিবাহের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বিবাহকে দুই প্রকারে বিভক্ত করা যায়। একবিবাহ (monogamy), সেখানে কেবলমাত্র একজন পুরুষ একজন স্ত্রীর সহিত দাম্পত্যজীবন যাপন করিতে পারে। স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কেহ মারা গেলে অথবা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কেহ আইনসঙ্গতভাবে পরিত্যাগপূর্বক পুনরায় বিবাহ করিলে তখন ইহাকে একবিবাহ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। আন্দামানীরা এক ।ববাহপন্থী। ওনা (Ona) বা এস্কিমো (Eskimo)-রা আইনগতভাবে একবিবাহ করিয়া থাকে। স্বামী-স্ত্রীর কোন একজনের মৃতু না হওয়া পর্যন্ত অথবা তাহাদের বিবাহ-বন্ধন আইনগত ভাবে শিথিল না হওয়া পর্যন্ত পুনর্বিবাহ (Remarriage) করা উচিত নয় বলিয়া খৃষ্টানসমাজে প্রচলিত। বর্তমান ভারত সরকার আইনের মাধ্যমে এক বিবাহ বিধিবদ্ধ করিয়াছে। বহুবিবাহ (Polygámy)-এর মাধ্যমে একজন পুরুষ একাধিক পত্নী অথবা

একজন স্ত্রী একাধিক পতি, কিংবা বহু পুরুষ বহু পত্নী সামাজিক অনুমোদন ক্রমে গ্রহণ করিতে পারে। ইহার মোটামুটি তিনটি উপবিভাগ আছে।

(ক) বহুপত্নীমূলক বিবাহ (Polygyny) : যে বিবাহের মাধ্যমে একজন পুরুষ একসংগে একাধিক দার পরিগ্রহণ করিতে পারে তাহাকে বহুপত্নীবিবাহ বলা হয়। পৃথিবীর বহু দেশে, বহু সমাজব্যবস্থায় এই রকমের বিবাহ অনুমোদিত। আমাদের দেশে পৌরাণিক আখ্যানে উদাহরণের অভাব নাই। আফ্রিকার কোন কোন সমাজে নরপতিদের কয়েকশত স্ত্রী রাখার সংবাদ পাওয়া যায়। উগাণ্ডা (Uganda)-দের মধ্যেও অনুরূপ রীতি প্রচলিত। মুসলমান সমাজে অন্ততঃ চারিজন স্ত্রী রাখা সমাজ-অনুমোদিত রীতি।

আদিবাসী সমাজে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ ও লোধারা তাহাদের ব্যতিক্রম নয়। সাধারণতঃ ইহা লক্ষ্য করা গিয়াছে কৃষিজীবী-মানুষ কাজকর্মের সুবিধার জন্য একাধিক পত্নী রাখার প্রয়াসী হইত। যখন সমস্ত স্ত্রী একই সংগে থাকিত তাহাদের মধ্যে একজন প্রধানারূপে অন্যান্য স্ত্রীদের উপর কর্তৃত্ব করিত। পশ্চাতে বহুস্ত্রী রাখার অর্থ নৈতিক ভূমিকা আছে বলিয়া অনেকের ধারণা।

আবার যদি কোন সমাজে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অধিক হয় তবে অনিবার্য ভাবে বহুপত্নী রাখা সমীচীন হয়। মুসলমান সমাজে বহুপত্নাবিবাহ প্রচলনের জন্য এই যুক্তি দেওয়া হয়। কোন দেশে যুদ্ধের পর স্বাভাবিক ভাবে পুরুষসংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হয় তখন একাধিক পত্নীর প্রয়োজন হয়। বিশেষ ভাবে হিন্দু ধর্মে 'পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্যা'—এই মত প্রবল হওয়ায় পুত্রলাভের জন্যে অনেকে অধিক দার পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

আফ্রিকার থোঙ্গা (Thonga) উপজাতিদের মধ্যে অধিক স্ত্রী থাকা মর্যাদা সূচক। অবশ্য অধিক স্ত্রী তাহাদের সন্তানসন্ততি সহ গৃহস্বামীকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকে।

কখনও বা পুরুষেরা ভোগলালসার বশবর্তী হইয়া অধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে চায়। এইভাবে ধীরে ধীরে বহুস্ত্রী রাখা সমাজ অনুমোদিত রীতি হইয়া দাঁড়ায়।

আমাদের দেশে নাগাদের মধ্যে অনেক সময় বেশী স্ত্রী রাখা নজরে পড়ে। স্ত্রীরা খুব পরিশ্রম করে বলিয়া তাহাদের শরীর বা শ্রী নষ্ট হয়। তখন পুরুষ নূতন বিবাহ করিয়া থাকে।

পরিবারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য পত্নীদেব শ্রম করিতে হয়। যদি একজন স্ত্রী থাকে এবং তাহার অসুখবিসুখে অথবা সন্তান সম্ভাবনার সময়ে সে তাহার স্বামীর সেবাযত্ন বা পরিচর্যা করিতে অসমর্থ হয়, সেই অবস্থায় স্বামী সুখে থাকিতে চাহিলে একাধিক বিবাহ করিয়া থাকে। এইসব কারণে সমাজে বহুপত্নীবিবাহ প্রচলিত হইয়াছে।

(খ) বহুপতি (Polyandry): যখন একজন নারীর একসংগে অনেকগুলি স্বামী থাকে তাহাকে বহুপতি বিবাহ বলা হয়। বহুপতি বিবাহ আবার দুই রকমর হইতে পারে। যদি স্বামীরা পরস্পর ভাই হয় তাহাকে ভ্রাতৃত্বমূলক (Fraternal) বহুপতি বিবাহ আর স্বামীরা যদি পরস্পর ভাই না হইয়া সমাজেব যে কোন ব্যক্তি হয় তাহাকে অভ্রাতৃত্ব (Non-fraternal)-মূলক বহুপতি বিবাহ বলা হয়। ভারতবর্ষে এই দুই প্রকারেব বিবাহরীতি দেখিতে পাওয়া যায়। নীলগিরি পাহাড়ের টোডা (Toda) উপজাতির লোকেরা দুই প্রকার বহুপতি বিবাহ স্বীকার করিয়া লইয়াছে। হিমালয় অঞ্চলের খাসা (Khasa) উপজাতির ভাইরা একজন স্ত্রীকে বিবাহ করে। আবার তিব্বতীয়গণ অভ্রাতৃত্বমূলক বহুপতি বিবাহ সমাজ-অনুমোদিত রীতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। দক্ষিণ-ভারতের নায়ার (Nair)-দের মধ্যে একজন স্ত্রীর সহিত বহু পরুষের মিলন অনুমোদিত। কিন্তু তাহাকে ঠিক বিবাহ বলা চলে না, যদিও পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে স্বামীরা পরস্পর সহযোগিতায় পারবার প্রতিপালন করিয়া থাকে। এই বহুপতি বিবাহে স্ত্রী প্রত্যেক স্বামীর

নিকট কিছুদিন একসংগে যাপন করে। বিশেষ করিয়া টোডাদের মধ্যে স্ত্রী ১৫ দিনের বেশী একসংগে থাকে না।

এই বিবাহের প্রচলন খুবই সীমাবদ্ধ। ইহার মূলে অনেকে নানারকম ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। টোডা বহুপতি বিবাহের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যার কমবেশীর জন্য এই বিবাহ চলিতেছে। প্রথমতঃ তাহাদের সমাজে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। নিম্নের হিসাবে সহজেই তাহা প্রমাণিত হইবে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রতি ১০০ জন টোডা নারীর সংখ্যানুপাতে ১৪০.৬ জন পুরুষ ছিল, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ১০০ জন স্ত্রীর অনুপাতে ১৩৫.৯ জন পুরুষ, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ১০০ঃ ১২৩·৪। বর্তমানে আইনের মাধ্যমে শিশু কন্যাহত্যা রহিত করিয়া দেওয়ার ফলে তাহাদের মধ্যে স্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

অনেকের বিশ্বাস দেশে উপযুক্ত কৃষিযোগ্য জমির অভাব বলিয়া জন্মহার সংকোচনের জন্য এই পন্থা সমাজ স্বীকার করিয়া লইয়াছে। যেমন তিব্বতীরা।

কেহ কেহ বলেন একই রক্তসম্পর্কে বিবাহ বন্ধন স্থাপিত হইলে পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই যুক্তি অলীক বলিয়া মনে হয়।

আবার অনেক উপজাতিদের মধ্যে বিশেষ করিয়া অষ্ট্রেলীয় উপজাতির মধ্যে শিকার-জীবীমানুষ একা স্ত্রাকে বাড়ীতে রাখিয়া যাইবার অসুবিধাহেতু অন্য স্বামীর সাহচর্য অনুমোদন করিয়া থাকে। এইভাবে ধীরে ধীরে বহুপতি বিবাহের রীতি প্রচলিত হইয়াছে।

আবার নিশ্চিতরূপে সন্তান কামনায় কোন কোন সমাজ বহু স্বামী পছন্দ করিয়া থাকে। ইহাও এক বহুপতি বিবাহের কারণ।

অনেকের ধারণা আদিম সমাজব্যবস্থার অবাধমিলনের স্মারক (Survival) হিসাবে বহুপতি বিবাহের নিদর্শন পাওয়া যায়।

(গ) যৌথ বিবাহ (Group marriage) যৌথ বা দলগত বিবাহ বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ঠিক দেখিতে পাওয়া যায় না। কেননা

যৌথ বিবাহের প্রধান লক্ষণ হইবে সন্তানসন্ততির কোন নির্দিষ্ট পিতা বা মাতা থাকিবে না। প্রাগ্ ঐতিহাসিক সমাজব্যবস্থায় এইরকমের বিবাহ ও পরিবার ছিল বলিয়া অনেকে বলেন। টোডা উপজাতির লোক বহু পুরুষ বহু স্ত্রীকে একই সংগে বিবাহ করে কিন্তু সেই সন্তান-সন্ততিদের এক সামাজিক পিতৃত্ব স্বীকৃত হয় বলিয়া ইহা যৌথ বিবাহ নয়। এক সামাজিক অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহাদের সামাজিক পিতৃত্ব স্বীকৃত হয়। মার্কুসীয় দ্বীপের অধিবাসীদের অথবা অস্ট্রেলীয় ডেইরীদের দাম্পত্য জীবনে বহুপত্নী বা বহুপতি সংশ্রবের এক অদ্ভুত রীতি রহিয়াছে। ঐ একই কারণে তাহা যৌথ বিবাহের পর্যায়ে পড়ে না। যাঁহাবা বিভিন্ন স্মারক-রীতি (Cultural trait) পর্যালোচনা করিয়া সমাজের ক্রমবিকাশ বিচার করেন তাঁহাদের মতে একই আখ্যায় (Terms of address) অনেককে ডাকা হইলে লোকজনদের একই সামাজিক গুরুত্ব থাকা স্বাভাবিক বলিয়া একই আখ্যায় তাহারা অভিহিত হইয়া থাকে। এখনও বহু উপজাতির সমাজ-জীবনে এই ধরনের এমন আখ্যা থাকে যাহাতে বহু লোককে সূচিত করে। তাহার দ্বারা তাহাদের সম-সামজিক মর্যাদা বা সম-কার্যক্রম ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।

বিবাহপ্রথার ধরন (Methods of getting wife): আচার অনুষ্ঠান অথবা নানা ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে বিবাহরীতির তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজ-গোষ্ঠী এই রীতিগুলিকে নানাভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। সেগুলিকে নিম্নভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

পৈশাচ বা রাক্ষস বিবাহ (Marriage by capture): জোর পূর্বক বিবাহ অনেক সমাজে অনুমোদিত রীতি ছিল। কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া বিবাহ এই রীতির বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষে নানা উপজাতির মধ্যে এই রকম বিবাহ সমাজ-অনুমোদিত। গন্দ, ভীল (Bhil) প্রভৃতি উপজাতির লোকেরা অনেক সময় বিচ্ছিন্নভাবে জোরপূর্বক নারী ছিনাইয়া তাহাকে বিবাহ করে। যদিও এই বিবাহ

বহুলভাবে প্রচারিত নয় তবুও তাহাদের বিবাহরীতির বা ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যাখ্যা করিলে অর্থাৎ বিবাহের পূর্বে উভয় পক্ষের কৃত্রিম যুদ্ধ, অথবা অনুষ্ঠানের পূর্বে কন্যার ক্রন্দন করা ইত্যাদি হইল জোরপূর্বক বিবাহের অর্থসূচক। আফ্রিকার বুশমেন (Bushmen) এবং বাহিমা (Bahima) উপজাতির বিবাহকালীন কৃত্রিম যুদ্ধ ও কন্যার গোপনে লুকাইয়া থাকা এই রীতির সমর্থক। তাহার পর বরপক্ষ তাহাকে আবিষ্কার করিয়া ধরিতে পারিলে বিবাহ হয়। 'হো' বা 'বিরহড়' উপজাতির মধ্যে বিবাহেচ্ছু পুরুষ লুকাইয়া থাকে এবং সে প্রচ্ছন্নভাবে ভাবীর স্ত্রীর কপালে সিঁদুর ছুয়াইয়া দিলে সামাজিক রীতি অনুযায়ী কন্যা তাহার পত্নী হইয়া যায়।

প্রজাপত্য বিবাহ (Marriage by negotiation): স্বাভাবিক ভাবে বিবাহযোগ্য পাত্রপাত্রীর অনুসন্ধান করিয়া যৌতুক বা পণ নির্ধারণ করিয়া বিবাহ করাকে প্রজাপত্য বিবাহ বলে। লোধা ও হো উপজাতিরর মধ্যে ঘটক (Go-between) থাকে, সে উভয় পক্ষের সংগে কথাবার্তা ঠিক করিয়া নির্দিষ্ট তারিখে বিবাহকার্য সমাধা করে। লোধাদের ঐ সময় একটি থালায় দুর্বা, ধান ও টাকা দিতে হয়। সাঁওতাল বা ওরাওঁদের টাকা অথবা কাপড় দিতে হয়। নাগারা দা, বর্ম, নানাবিধ শস্য দিয়া থাকে। বিবাহের পূর্বে কন্যার কতৃপক্ষ এই সব পায় বলিয়া অনেকে ইহাকে 'পণ প্রথায় বিবাহ' (Marriage by purchase) বলিয়া থাকে। সাঁওতালদের মধ্যে অনেক সময় বিবাহের জন্য পাত্রকে টাকা দিতে হয়। যদি অবাধ মেলামেশার জন্য কোন কুমারীকন্যা সন্তানসম্ভবা হয় তখন কোন পাত্রকে টাকা দিয়া রাজি করানো হয় যাহাতে সে ঐ ভাবী সন্তানের পিতৃত্ব লইতে পারে। বিবাহের পূর্বে পাত্রের কতৃপক্ষ বেশী টাকা চাহিয়া বসে। ইহা সংগ্রহ করা সকল সময় সম্ভব হয় না। তাই হো প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে অন্য প্রথার বিবাহ প্রচলিত হইতেছে। আঙ্গামী ও আও (Ao) নাগাদের মধ্যে পণপ্রথা নাই বলিয়া নারীর মর্যাদা কমিয়া গিয়াছে।

পাল্টা ঘর (Marriage by exchange) : এই বিবাহের রীতি অনুযায়ী দুইটি পরিবারের বিবাহযোগ্য পাত্রপাত্রীর মধ্যে সম্বন্ধ ঠিক হয়। ভারতবর্ষের বহু উপজাতির মধ্যে এই ধরনের বিবাহ প্রচলিত। আলমোড়ার ভোটিয়া অথবা ছোটনাগপুরের ওরাওঁদের মধ্যে ইহার প্রচলন বেশী দেখা যায়। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের উপজাতির মধ্যেও ইহা বেশ প্রচলিত।

শ্রম বিনিময়ে বিবাহ (Marriage by service): অনেক সমাজে প্রচলিত পণ দিতে না পারিলে কখনও কখনও শ্রম বিনিময়ে বিবাহ সাধিত হয়। গন্দ বা বাইগা (Baiga) উপজাতির মধ্যে এই রকমের বিবাহপ্রথা আছে। বরকে তাহার ভাবী শ্বশুরের বাড়ীতে নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর থাকিতে হয়। ঐ সময় বরকে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়, কিন্তু কন্যার সহিত কোনরূপ মেলামেশা করিবার সুযোগ দেওয়া হয় না। পরে নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। মধ্যভারতেব মেলঘাট অঞ্চলের করকু উপজাতির মধ্যে এই ধরনের বিবাহেব রীতি আছে।

শক্তি পরীক্ষায় বিবাহ (Marriage by trial) : বিবাহের পূর্বে ববকে শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। এই ধরনের বিবাহ বর্তমানে খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। ভীল (Bhil) উপজাতির মধ্যে এই বিবাহ প্রচলিত। নৃত্যগীতের মাধ্যমে বা শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই বিবাহ সাধিত হয়। আমেরিকার রাউপজাতি আথাবাসকান (Athabascan) মল্লযুদ্ধ করিয়া জয়ী হইলে বিজয়ীর কন্যালাভ ঘটে।

অনাহূত বিবাহ (Marriag by intrusion) : এই বিবাহে বরের মত থাকে না বলিয়া কন্যা জোরপূর্বক বরের বাড়ীতে আসে। হো বা বিরহড়দের মধ্যে এই রীতি দেখা যায়। বিরহড় কন্যা কোন এক সুপ্রভাতে ঝুড়িতে করিয়া মহুয়া ফুল, অথবা কোন খাদ্যদ্রব্য লইয়া আকাঙ্খিতের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। ভাবা শাশুড়ী ক্রুদ্ধা হইয়া তাহাকে সম্মার্জনী দিয়া প্রহার করে। কখনও বা লঙ্কা পুড়াইয়া তাহার ধোঁয়া

দেওয়া হয়। এই ঘটনার পর গ্রামের মাতব্বর উপস্থিত হইয়া বিবাহ অনুমোদন করিয়া থাকে।

গান্ধর্ব বিবাহ (Marriage by elopement or mutual consent): এই সব বিবাহে বর বা কন্যার পিতামাতার কোন মত থাকে না বলিয়া বর-কন্যা গোপনে পলায়ন করিয়া থাকে। ওরাওঁ ও লোধাদের মধ্যে এই বিবাহ দেখা যায়। বিবাহের কয়েক বৎসর পর যখন সন্তানসন্ততি হয় তখন তাহাদের লইয়া পুনরায় তাহারা স্বগ্রামে ফিরিয়া আসে। তখন বিবাহিত দম্পতিকে গ্রাম্যভোজন করাইতে হয়। এইভাবে এই বিবাহ সমাজে অনুমোদন পাইয়া থাকে। এই সমস্ত প্রথায় বিবাহ ছাড়া কখনও উপজাতি সমাজে গাছ বা প্রাণী-বিবাহ, দেখা যায়। ওরাওঁরা বিবাহের পূর্বে আমগাছ বা মহুয়া গাছকে বিবাহ করে। যদি বিবাহে কোন বিপর্যয় ঘটে তখন যেন গাছের উপর দিয়া যাইবে। হিন্দু সমাজে পায়রা, কলাগাছ ইত্যাদির সহিত বিবাহের রীতি প্রচলিত। যেখানে অনেকবার পত্নীবিয়োগ হয় তখনই এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তাহার পর বরের সহিত কন্যার বিবাহ হয়।

বিবাহের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবারের সহিত সম্বন্ধ বা সম্পর্ক স্থাপিত হয়। জ্ঞাতি, আত্মীয়, কুটুম্ব, বান্ধবদের মধ্যে সম্পর্ক নিগূঢ় হইয়া উঠে। বিবাহের বিধিপ্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে যে সমাজ বা গোষ্ঠীতে বৈবাহিক সম্পর্কস্থাপন করিবার জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট রীতি মানিয়া চলে। এই মানিয়া চলাটাই হইল সামাজিক অনুশাসন। এই সামাজিক অনুশাসনের পশ্চাতে মানুষ বা সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক· যুক্তি বা অন্যান্য পরিপূরক সামাজিক তাগিদও রহিয়াছে। সেই সবগুলিরই সমন্বয়ে সামাজিক অনুশাসন দৃঢ় হয়, সম্পর্ক ও আত্মীয়তা গভীর হয়; ব্যক্তি বিশেষের ক্রিয়াকর্মের ধরনও পরিবর্তিত হয়।

কোথাও সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী কতকগুলি নির্দিষ্ট পন্থায় বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করিবার প্রয়াস পায়। ঐ নির্দিষ্ট পন্থাগুলি বাধ্যতামূলক রীতি বলিয়া পরিগণিত হয়। এমন কি কেহ তাহার ব্যতিক্রম করিলে তাহাকে তাহার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। এই বাধ্যতামূলক নির্দিষ্ট

পক্ষার বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করাকে বাঞ্ছনীয় বিবাহ, (Preferential mating) বলা হয়। বাঞ্ছনীয় বিবাহের প্রকার ভেদ আছে। যেমন, (১) জ্ঞাতি বিবাহ (Parallel cousin marriage), (২) আত্মীয় বিবাহ (Cross cousin marriage), (৩) দেবরণ (Levirate) এবং (৪) শালিবরণ (Sorrorate). জ্ঞাতি বা আত্মীয়দের সংগে রক্তের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে। অথচ বিশেষ বিশেষ সমাজ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এই বিবাহের অনুমোদন করিয়াছে। অবশ্য এই বিবাহের রীতি সমাজে প্রচলিত থাকায় ভাবী স্বামী-স্ত্রী কে বা কাহারা হইবে তাহা পূর্ব হইতে বুঝিতে পারা যায়। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে ঘনিষ্ঠতা জন্মে, পরে তাহা স্থায়ী মিলনে পরিণত হয়। সিংহল দ্বীপের ভেদ্দা (Veddah) উপজাতিদের মধ্যে আত্মীয় বিবাহের চলন থাকায় বিবাহের পূর্বে ঘনিষ্ঠতা জমে এবং তাহাদের বিবাহে এমন কোন উল্লেখযোগ্য আচার অনুষ্ঠান নাই বলিলেই চলে। জ্ঞাতি বিবাহ (Parallel cousin marriage) কেবলমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে। এই বিবাহ কেবলমাত্র দুই ভাইয়েব অথবা দুই ভগিনীর পুত্রকন্যাদেব মধ্যে বিবাহ করাকে বুঝায়। দুই ভাইয়ের পুত্রকন্যা অর্থাৎ বাবা, কাকা অথবা জেঠাদের সন্তানসন্ততি আর দুই ভগিনী পুত্রকন্যা অর্থে মাসীমাদের সন্তানসন্ততি বুঝাইয়া থাকে। ইহাদের বিবাহ করাটা যখন বাধ্যতামূলক বা স্বাভাবিক অথবা প্রথম করণীয় বলিয়া বিবেচ্য হয় তখনই ইহা বাঞ্ছনীয় বিবাহ। ইহার মূলে রহিয়াছে পারিবারিক বন্ধন আরও দৃঢ় করা। মুসলমান সমাজে মেয়েরা বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া থাকে। নিকট জ্ঞাতির মধ্যে বিবাহ করিলে তাহা তাহাদের মধ্যে থাকিবে। এইভাবে যুক্তি দেখান হইয়া থাকে।

আত্মীয়-বিবাহ (Cross cousin marriage) হইল ভ্রাতা ও ভগিনীর পুত্রকন্যার মধ্যে বিবাহ অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি মাতুল-কন্যা (M. B. D. Mother's Brother's Daughter) অথবা পিতৃস্বসা-কন্যা (F. S. D. Father's Daughter marriage)-কে বিবাহ

করিয়া থাকে। সেই সমাজে আত্মীয়-বিবাহ আছে বলিয়া ধরা হয়। ভারতবর্ষের বহু উপজাতিদের মধ্যে এই বিবাহরীতি দেখা যায়। নীলগিবি পাহাড়ের টোডা, সিংহলের ভেদ্দা, মধ্যভারতের গন্দ উপজাতি, গারো পাহাড়ের গারো উপজাতির মধ্যে এই বিবাহ এক প্রচলিত রীতি। দেখা যাইতেছে ইহারও দুইটি ধরন হয়। প্রতিসম আত্মীয়-বিবাহ (Symmetrical cross cousin marriage) আর একটি হইল অপ্রতিসম (Asymmetrical) আত্মীয়-বিবাহ। প্রতিসম আত্মীয়-বিবাহে কেবলমাত্র পিতৃস্বসা-কন্যা অথবা কেবল মাতুল-কন্যা, যে কোন একজনকে বিবাহ কবিবার রীতি থাকে। আর অপ্রতিসম আত্মীয়-বিবাহে পিতৃস্বসা-কন্যা (F. S. D.) অথবা মাতুল কন্যা দুইজনের যে কোন একজনকে বিবাহ করিবার অধিকার থাকে।

নীচের ছকটি দেখিলে পরিষ্কার হইবে।
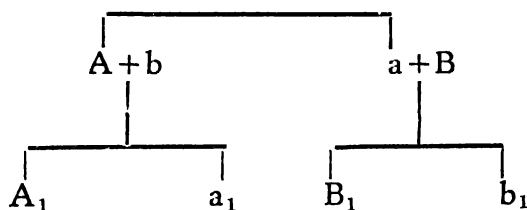
এই ছকে দেখা যাইতেছে A এবং a একটি পিতৃকেন্দ্রিক সমাজ-ব্যবস্থাব ভ্রাতা ও ভগিনী। Aর সহিত b ও ভগিনী a-র সহিত B বিবাহ হইয়াছে। তাহাদের পুত্রকন্যাগুলি A_1 এবং a_1 আর B_1 এবং b_1বলিয়া সূচিত হইয়াছে। এখন A_1, a_1, B_1, b_1 পরস্পর জ্ঞাতি বা আত্মীয় ভ্রাতা ও ভগিনী। যদি A_1 এর সহিত b_1 এর বিবাহ হয় তবে A_1 তাহার পিতৃস্বসা কন্যা (F. S. D)-কে বিবাহ করিল বলিতে হইবে। ইহা এক ধরনের। আবার B_1 যদি a_1-কে বিবাহ করিয়া থাকে তবে B_1 তাহার মাতুলকন্যা (M. B. D)-কে বিবাহ করিয়াছে সুতরাং ইহাও আর এক ধরনের আত্মীয় বিবাহ।

ইউরোপ মহাদেশ ব্যতীত পৃথিবীর সর্বত্র এই বিবাহের প্রচলন অল্প বিস্তর দেখা যায়। আফ্রিকার হটেনটট (Hottentot) বা বান্টু (Bantu)-দের মধ্যে, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বহু অঞ্চলে ইহা প্রচলিত। ভারতবর্ষের উল্লিখিত উদাহরণ ছাড়া দক্ষিণ-ভারতের শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে মাতুলকন্যা-বিবাহ একটি আদরণীয় প্রথা।

এই বিবাহের মূলে কতকগুলি কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। যদিও পৃথিবীর সর্বত্র একই কারণে এই বিবাহ ঘটিতেছে না তবুও সমাজেব বিশেষ এক অবস্থার সংগে জড়িত বলিয়া সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসে ইহার আলোচনা অত্যন্ত প্রয়োজন। টাইলর প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদের মতে যেখানে সমাজে দ্বৈতদল (Moiety বা Dual organisation) বা ঐ রকম সমাজব্যবস্থা প্রচলিত এবং যেখানে ঐ দলগুলির লোকজন নিজেদের মধ্যে বিবাহ কবে না (Exogamous) সেইখানে অতি স্বাভাবিকভাবে এই ধবনেব আত্মীয়-বিবাহ বা ক্রশ কাজিন-বিবাহ ঘটিতে পাবে। ধরা যাউক গন্দ উপজাতিদেব ক ও খ দুইটি দল আছে। ক দলেব গোত্রগুলিকে খ দলের গোত্রগুলির সংগে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। ক দলের A-এর ভগিনী a-কে খ দলের B-এব সহিত বিবাহ দিলে A-এর পুত্রকন্যা ক দলের এবং a-এর পুত্রকন্যা খ দলের হইবে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে বিবাহ হইলে তাহা আত্মীয়-বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইবে। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। অনেক সমাজে এই ধরনের আত্মীয়-বিবাহ রহিয়াছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে দ্বৈতদলের কোন নিশানা নাই।

ডঃ রিভার্স ম্যালানেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার উপজাতিদের মধ্যে এই ধরনের বিবাহরীতি লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার ধারণা এইসব অঞ্চলে বৃদ্ধাধিপত্য (Gerontocrasy) বা যূথনারী-বিবাহ প্রচলিত থাকায় বয়োজ্যেষ্ঠরা সমাজের বেশীর ভাগ বিবাহযোগ্য কন্যাকে নিজেদের অধীনে রাখিবার প্রয়াস পাইত। পবে মাতৃপ্রধান সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যে স্বীয় ভাগিনেয়কে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা স্ত্রীদের সহিত

বিবাহ দিতে পারিত। ধীরে ধীরে তাহা রহিত হইয়া নিজ কন্যাদের বিবাহ দিবার প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে।

গিফোর্ড সাহেব আমেরিকার কালিফর্ণিয়ার মিয়োক (Miwok)-দের মধ্যে এই প্রথা লক্ষ্য করিয়া বলেন যে তাহারা এককালে সম্বন্ধী (Wife's brother)-র কন্যাকে বিবাহ করিত। ক্রমে তাহারা নিজ পুত্রদের সেই অধিকার দেওয়ায় এই ধরনের বিবাহপ্রথা দেখা যাইতেছে।

সোয়ান্টন-এর মতে বৃটিশ কলম্বিয়ার উপজাতিরা বিষয়সম্পত্তিতে পারস্পরিক অধিকার অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য এই বিবাহ অনুমোদন করিয়াছে। ইহার অর্থনৈতিক দিক হইল বিবাহযোগ্যা কন্যার জন্য পণ (Bride price) না দেওয়া। এই ধরনের প্রথায় উভয় পক্ষ কন্যাপণ দিবার অসুবিধা হইতে রক্ষা পায়। গন্দদের মধ্যে এই বিবাহ প্রচলিত ও বাধ্যতামূলক থাকায় যদি কেহ তাহার ব্যতিক্রম করিয়া থাকে তাহার জন্য ক্ষতিপূরণের দাবী করিতে পারে। তাহারা মনে করে যেহেতু A-র পরিবার B-র পরিবারে নিজ ভগিনী a-কে বিবাহ দিয়াছে, সেইজন্যে B-র প্রধান কাজ হইবে নিজ কন্যা b_1-কে A-র পরিবারে অর্থাৎ A -কে বিবাহ দেওয়া। এই প্রথাকে 'দুধ লৌটানা' (Bringing back of milk) বলিয়া অভিহিত করে।

দেবরণ (Levirate) হইল মৃত স্বামীর ভ্রাতাকে বিবাহ করা। ইহা একরকমের বাধ্যতামূলক বিধবাবিবাহ। পৃথিবীর বিভিন্ন উপজাতি-সমাজে এই বিবাহ বহুল পরিমাণে প্রচলিত। তবে বেশীর ভাগ স্থলে বিধবা তাহার স্বামীর কনিষ্ঠকে অর্থাৎ দেবরকে বিবাহ করে। এই কনিষ্ঠ দেবরণ (Junior Levirate) আমাদের দেশে লোধা, সাঁওতাল এবং উড়িষ্যার বহু উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত। জ্যেষ্ঠকে বরণ (Senior Levirate) প্রায়ই নাই। তবে হিন্দু শাস্ত্রে অপুত্রক অবস্থায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সন্তানমানসে ভ্রাতৃবধুকে বিবাহ করিবার অনুমোদন ছিল। কনিষ্ঠ দেবরণ সম্পর্কে নানা কারণ বলা হয়। যেখানে কন্যাকে রীতিমত পণটাকা (Bride price)

দিয়া বিবাহ করা হয় আর হঠাৎ যদি তাহার স্বামী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার মৃত স্বামীর পরিবার সেই বিধবাকে ছাড়িয়া দিতে রাজি হয় না। সুতরাং স্বাভাবিক অধিকার হিসাবে তাহাকে পত্নী বলিয়া দাবী করে। কোন কোন সমাজে যদি ঐ বিধবা অন্য কাহাকে বিবাহ করে মৃত স্বামীর ভ্রাতা পণটাকা ফিরিয়া পাইবার অধিকার রাখে।

শালিবরণ (Sorrorate) হইল আর এক ধরনের বাঞ্ছনীয় এবং বাধ্যতামূলক বিবাহ; বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে ইহার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। ইহারও দুইটি ধরন আছে। স্ত্রীর জীবদ্দশায় তাহার ভগিনীগুলিকে বিবাহ করা যাহাকে অবাধ শালিবরণ (Non restricted Sorrorate) বলা হয়। আবার স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাহার ভগিনীকে বিবাহ করা সীমিত শালিবরণ (Restricted Sorrorate) বলা হয়। হয়ত অর্থনৈতিক কারণে এই বিবাহ ঘটিয়া থাকে। কেননা কন্যাপণ দিয়া বিবাহ করার পর স্ত্রী গতা হইলে স্বামীর পক্ষে ঐ পরিবারের বিবাহ-যোগ্যা ভগিনীকে বিবাহ করা সমীচীন। আবার একই সাথে অনেকগুলি ভগিনীকে বিবাহ করিলে তাহাকে শালিপ্রধান বহুপত্নী (Sorroral Polygyny) বিবাহ বলা হয়।

উভয়বিধ জ্ঞাতিবিবাহ ও আত্মীয়বিবাহের ফলে সম্পর্কেরও হেরফের হয়। কেননা যিনি সম্পর্কে খুল্লতাত তাহার কন্যাকে বিবাহ করিলে তিনি শ্বশুর বলিয়া অভিহিত হইবেন। ঠিক তেমনি ভাবে মাতুলকন্যা বিবাহ করিলে মাতুলশ্বশুর পদবাচ্য হইবেন। সেইজন্য উপজাতি সমাজে আত্মীয়সূচক আখ্যার মাধ্যমে সমাজের গঠন বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এমন হইতে পারে যেখানে মাতুলকন্যা বিবাহ করা স্বাভাবিক রীতি সেখানে মাতুল ও শ্বশুর একই আখ্যায় পরিচিত হইবে সন্দেহ নাই।

পরিমেল বা সংঘ

জীবনের সুরু হইতে একক মানুষ তাহার সমস্ত প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ হয় নাই। খাদ্যান্বেষণ হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মরক্ষা ও সমাজের বিবিধ কার্যাবলী সব কিছুই সমবেত চেষ্টার মাধ্যমে সম্ভবপর। সেইজন্য জীবন ও সংস্কৃতির স্থায়ীত্ব ও ব্যাপ্তির জন্য যূথবদ্ধতা হইল প্রাথমিক পর্যায়ের সংস্থা। নৃবিজ্ঞানীর মতে আত্মীয়-বন্ধন ও রক্ত-সম্পর্ক ব্যতিরেকে যে যূথবদ্ধতা সমাজের বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পরিদৃষ্ট হয় তাহাই হইল পরিমেল বা সংঘ। পৃথিবীর বিভিন্ন উপজাতির জীবনসংস্কৃতি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে ইহারও অনেক প্রকারভেদ আছে। কতকগুলি মূলত স্বেচ্ছাধীন (Voluntary) আর অনেকগুলি বাধ্যতামূলক (Involuntary) অর্থাৎ বিভিন্ন উপজাতিগোষ্ঠী ইচ্ছা করিলে সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানাদির দ্বারা ও তাহার বিধি ও নিয়ম মানিয়া চলিলে এই রকম পরিমেলের দলভুক্ত হইতে পারে। আবার অনেকগুলি সমাজে তাহা নাই। সমাজে জন্মগ্রহণ করিলেই তাহাকে বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন দলের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া চলিতে হইবে। যাহাই হউক পরিমেল বা সংঘ বিভিন্ন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কখনও বা বয়সের স্তরভেদ (Age group), স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ (Sex), উপজীবিকা (Occupation), মর্যাদা (Rank and status)-এর উপর নির্ভর করিয়া থাকে। পরিমেলের সহিত একটি জনসমষ্টি বা সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রভেদ রহিয়াছে। কেননা সম্প্রদায় বা জনসমষ্টি এক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে আর পরিমেল মানবের আদিম প্রয়োজন চরিতার্থ করিতে সুসংবদ্ধ হয়।

এই সমস্ত পরিমেলগুলির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণতঃ

তাহাদের থাকিবার বা বসিবার জন্য আড্ডাঘর বা শয়নাগার (Dormitory) থাকে। গন্দ উপজাতিদের 'গটুল ঘর', ওরাওঁ উপজাতির 'যোং এড়পা' বা 'ধুমকুড়িয়া' ; আও নাগাদের 'মোরং', গারোদের 'নোকপান্তে', মুণ্ডা বা বিরহড় উপজাতিদের 'গিতিওড়া' প্রভৃতি রহিয়াছে। যাহাদের তাহা নাই সেখানে মাতব্বরের বাড়ী (Head man's house) ব্যবহৃত হইতে পারে। স্ত্রীপুরুষভেদে পৃথক বাড়ী থাকে। যেমন কনিয়াক নাগার অনূঢ়া কন্যাদের 'ইও' আছে, ওরাওঁদের আছে 'পেল এড়পা' ইত্যাদি। পরিমলের সভ্য হইতে হইলে অনুষ্ঠানের (Initiation ceremony) নিয়ম আছে। অস্ট্রেলীয় উপজাতিদের মধ্যে বিশেষ বেশভূষা দেখিতে পাওয়া যায়।

বয়স্কের স্তরভেদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইল আও-নাগা উপজাতি। তাহাদের এই পরিমেল বাধ্যতামূলক। তাহাদের মোট সাতটি স্তর আছে এবং ইহা পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রতিটি স্তরের একটি নাম ও সভ্যদের বিভিন্ন কার্যাবলী রহিয়াছে। প্রতি তিন বৎসর অন্তর একটি দল হইতে উন্নীত হওয়া যায়। ৯ হইতে ১২ বৎসরের বালকদের লইয়া প্রথমের দল গঠিত হয়, তাহারা 'মোরাং'-এ থাকে। এই প্রথমের দলটির নাম 'নোজাবরিহড়ি' বা কিশোরগোষ্ঠী। তাহারা মোরাং বা শয়নাগারে রাত্রিবাস করেও উর্ধতন দলগুলির সভ্যদের সেবাযত্ন করিয়া থাকে। তাহার তিন বৎসর পরে তাহারা উচ্চদলে উন্নীত হয়। তাহারা তখন মর্যাদা সম্পন্ন যুবকদল বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় সমাজের নানাবিধ কাজকর্ম করে। ঐ সময় তাহারা বিবাহ করে। তাহার তিন বৎসর পরে ঐ দলটি মোরাং নায়কের দল বলিয়া গণ্য হয়। তখন তাহারা নরমুণ্ড শিকার, নৈশ আক্রমণ প্রভৃতি কঠিন কাজ করে। ইহার তিন বৎসরের পর উন্নীত হইলে তাহাদের শূকরের পা খাইতে দেওয়া হয়, ইহার পর তাহারা 'কুলপতি' আখ্যা পায়। তখন মোরাং-এর সংগে কোন সম্পর্ক থাকে না। গ্রাম ও সমাজ লইয়া ব্যস্ত থাকে। তিন বৎসর পরে তাহারা অপর দলে উন্নীত হয়। সে সময় নানা উৎসবের কার্যাদি করিয়া থাকে। ইহার তিন বৎসর

পরে 'মন্ত্রণাদাতা' আখ্যা পায়। গ্রাম্য পরিচালনায় তাহাদের বিশেষ ক্ষমতা থাকে। ইহার পর ঐ মন্ত্রণা সভার উন্নত সভ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। পরিশেষে তাহারা 'ধর্মযাজক' পদে উন্নীত হয়। এই ভাবে সারা জীবন বিভিন্ন দলের সভ্য থাকে।

তেমনি ভাবে ছোটনাগপুরের ওরাওঁ উপজাতিদের মধ্যে বয়সের তিনটি স্তর আছে। প্রথমটির নাম 'পুনাজোখার' বা 'শিক্ষানবিশ', দ্বিতীয়টিকে 'মধ্যবর্তী দল' আর তৃতীয়টিকে 'জ্যেষ্ঠ দল' বলিয়া অভিহিত করা হয়। বিবাহ হইয়া গেলে তাহারা ধুমকুড়িয়া পরিত্যাগ কবে। এখন অল্প বয়সে বিবাহের জন্য বা সন্তানসন্ততি হইলে সভ্যপদে ইস্তফা দেয়। ঐ সময় তাহারা সমাজের নানা কাজ, বিশেষতঃ কেহ অসুবিধায় পড়িলে তাহাকে কাজকর্মে সাহায্য করে, বিবাহ বা অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবক হয়, আর নাচগান করিয়া থাকে।

আমেরিকাব আদিবাসীদের 'গোপন সমিতি' 'সমর সংস্থা', অর্থাৎ তাহারা যুদ্ধ বা লুণ্ঠন ইত্যাদি দুঃসাহসিকতার কাজ করিয়া থাকে। সেই সব সমিতিতে নারীদের স্থান নাই। আবার অনেকে স্বপ্নে কোন কিছু জিনিসের আভাষ পাইলে সমজিনিসের স্বপ্নাদেশ-পাওয়া ব্যক্তিরা একটি দল গঠন করে। আমাদের দেশে হো উপজাতিদের 'দেওঁড়া' ডাইনীবিদ্যা শিখিবার গোপন শিবির বা কেন্দ্র আছে। তাহাতে শিক্ষানবিশদের গোপনে নানাবিধ ক্রিয়া-কাণ্ড করিতে হয়।

মোট কথা এই সমস্ত পরিমেলগুলির প্রয়োজন উপজাতি সমাজে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রাতটি মানুষকে সমাজের উপযোগী করিবার দায়িত্ব সমাজের, কি রণবিদ্যা, কি যাদুবিদ্যা অথবা অন্যান্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। তাই যুগে যুগে মানুষ নানা ভাবে দল বাঁধিয়া সমাজ ও সংস্কৃতির কর্ম ধারাকে প্রাণবন্ত রাখিতে চেষ্টা পাইতেছে।

পরিমেলের উদ্ভব সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত। অনেকের মতে

পুরুষদের যূথবদ্ধ হইয়া সমবেতভাবে সমাজ উন্নত করিবার চেষ্টা হইল আদিম সংস্কৃতির প্রেরণা। তাই বিশ্বের সর্বত্র পুরুষদের যূথবদ্ধ হইতে দেখা যায়। নারীদের এই রকম নাই। বর্তমানের 'ক্লাব' অনেকটা সেই রকম বলিয়া মনে হয়। পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক দল গড়িবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা অভিমত রহিয়াছে।

———

উপজাতি ও ভারতবর্ষ

ভারত ইউনিয়নে উপজাতির সংখ্যা প্রায় দুই কোটি। উপজাতি বা খণ্ডজাতি (Tribe) আর্য-পূর্ব ভারতের আদিম বাসিন্দা ছিল। কালের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নততর সমাজ সংস্কৃতির সংঘাতে তাহারা বাধ্য হইয়া সভ্য মানুষের সংস্পর্শের বাহিরে গিয়া আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। সেইজন্য আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের জীবনে পরিবর্তন দ্রুত আসে নাই। আসে নাই বলিয়া তাহারা এখনও বর্তমান সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় অনেকটা অনগ্রসর সম্প্রদায়রূপে বাস করিয়া আসিতেছে। উপজাতি প্রসঙ্গে ডঃ রিভার্স (Rivers) বলেন—তাহারা সমাজের একটি গোষ্ঠী যাহাদের জীবনে জটিলতা নাই। তাহারা এখনও একই ভাষা বলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করে, যাহাদের আকৃতি বা সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য আছে, নিজেদের নিয়মকানুন রক্ষার জন্য তাহাদের পঞ্চায়েত আছে এবং প্রয়োজন হইলে তাহারা গোষ্ঠী-সচেতন মনোবৃত্তি লইয়া যুদ্ধবিগ্রহ বা সংগ্রাম করিয়া থাকে। অবশ্য উপজাতিরা যে সব সময়ে একই অঞ্চলে বসবাস করিবে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না, কেননা যে সমস্ত উপজাতি যাযাবরের মত ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের ত স্থান পরিবর্তন করিতে হইবেই। আবার আন্দামানী অথবা কোন কোন অষ্ট্রেলীয় উপজাতিদের সর্দার বা নায়ক নাই। কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তিই প্রয়োজনমত সমাজের কথা চিন্তা করে অথবা সমাজ পরিচালনা করে। মোটকথা উপজাতিদের মধ্যে জীবনযাত্রায় বা স্বাচ্ছন্দ্যে অনগ্রসরতা লক্ষ্য করা যায় আর তাহারা বেশীর ভাগ জড়োপাসক (Animist)।

ভারতবর্ষের দুই কোটি উপজাতির সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক পর্যালোচনা করিলে কতকগুলি চরিত্র সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমতঃ কতকগুলি উপজাতি সম্প্রদায় আদিম খাদ্য সংগ্রহের (Food gathering) দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ্ করে। তাহারা ভীরু স্বভাবের। সভ্য মানুষের সংস্পর্শের বাহিরে পাহাড়পর্বতে অথবা অস্বাস্থ্যকর জংগলাকীর্ণ অঞ্চলে তাহাদের বসবাস। উড়িষ্যার জুয়াং (Juang), ছোটনাগপুর বা হাজারিবাগ অঞ্চলের বিরহড়্ (Birhor) অথবা ধলভূম অঞ্চলের খাড়িয়া (Kharia) প্রভৃতি সম্প্রদায় এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

আর কতকগুলি সম্প্রদায় হইল আসাম অঞ্চলের উপজাতি, বিশেষ করিয়া নাগা, কুকি গোষ্ঠীর। তাহারা বন্যপ্রথায় কৃষির (Shifting hill cultivation) করিয়া জীবিকা সংস্থান করে। তাহাদের জীবনে বৈচিত্র্য আছে, জীবনে উৎসাহ উদ্দীপনার অভাব নাই ; অল্পবিস্তর শিল্প বা কৃষির জন্য বাহিরের জনসমষ্টির সংগে তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক যোগাযোগ হইয়াছে, ফলে তাহাদের জীবনে পরিবর্তনের ছাপ পড়িয়াছে।

তৃতীয়তঃ কৃষিজীবী উপজাতি সম্প্রদায় যাহারা পরিবেশ পরিমণ্ডলের সহিত একান্তভাবে মিশিয়া গিয়াছে। যেমন মুণ্ডা, হো, ওরাওঁ, ভূমিজ প্রভৃতি। তাহাদের জীবনে হিন্দু আদর্শ রেখাপাত করিয়াছে, সেইজন্য সমাজ ও সংস্কৃতির দিক দিয়া তাহারা পরিবর্তনে সাড়া দিয়াছে। তাহাদের জীবনে উপজাতি-জীবনের আবেগময় উচ্ছ্বাসও রহিয়াছে। আবার পার্শ্ববর্তী হিন্দুদের দ্বারাও প্রভাবান্বিত বলিয়া বৃহত্তর হিন্দু গোষ্ঠীর প্রভাবকে অস্বীকার করিতে পারিতেছে না।

ইহা ছাড়া সম্পূর্ণভাবে হিন্দু প্রভাবান্বিত বহু সম্প্রদায় রহিয়াছে, যাহাদের দেহে উপজাতির ছাপ সুস্পষ্ট, মনে উপজাতি সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। পশ্চিমবাংলার রাজবংশী, বাগদী, বাউড়ী, আসামের আহোম, মধ্য-ভারতের রাজবংশী, গন্দ প্রভৃতি হইল এইসকল সম্প্রদায়ের উদাহরণ।

ভারতবর্ষের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির কথা আলোচনা করিলেই স্বভাবতই মনে পড়ে যে আসাম বা হিমালয়ের পার্বত্য

অঞ্চল, যাহা এখনও অরণ্যাবৃত, কৃষিযোগ্য ভূমি প্রায় নাই বলিলেই চলে এই অঞ্চলের মধ্যে বহু উপজাতি সম্প্রদায় রহিয়াছে। আবার ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার তরঙ্গায়িত মালভূমি, পশ্চিমবাংলার পশ্চিমাংশ ঐ অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। আবার মধ্যভারতের জংগলাকীর্ণ অঞ্চল আর বোম্বাই ও গুজরাটের কোন কোন অঞ্চল। পশ্চিম-ভারতে বিশেষ করিয়া বোম্বাই বা খান্দেশ অঞ্চলে ভীল (Bhil)-রা বাস করিয়া থাকে। পেনিনস্যুলার ভারতবর্ষে কিছু কিছু উপজাতি বা খণ্ডজাতির রহিয়াছে। ইহা ছাড়া আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে নিগ্রোবটু আকৃতির সম্প্রদায় বাস করিয়া আসিতেছে। এই সমস্ত অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষাভাষি বা দৈহিক বিভিন্নতার বহু গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় বসবাস করিয়া আসিতেছে। আসাম অঞ্চলের 'নাগা-কুকি' গোষ্ঠী ও 'বড়ো' গোষ্ঠী প্রধান। তাহাদের আকৃতিতে মঙ্গোলীয় চরিত্রের ছাপ সুস্পষ্ট। ছোটনাগপুর অঞ্চলের প্রাগ্‌দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সম্প্রদায় বাস করে, তাহাদের মধ্যে মুণ্ডারী (Mundari) ভাষা ও ওরাওঁদের মধ্যে দ্রাবিড় ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। ছত্তিশগড় বা মধ্য-ভারত অঞ্চলে গন্দদের মধ্যে দ্রাবিড় ভাষা প্রাচীন ভাষা।

ভারতীয় উপজাতির অর্থনৈতিক জীবনপ্রবাহ

অর্থনৈতিক জীবন প্রবাহ মূলত ভৌগোলিক বা পরিমণ্ডল পরিবেশের উপর নির্ভর করে। সভ্যতার ক্রম বিস্তারের সংগে সংগে যে যে সম্প্রদায় নিজেদের সনম্র দীনতা পরিহার পূর্বক বলিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে, তাহাদের জীবনযাত্রা অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে দ্রুত পরিবর্তন আসিয়াছে—তাহাদের অর্থনৈতিক কাঠামোতে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। সেইজন্য বর্তমানের বহু উপজাতি আর শংকিত সম্প্রদায় নহে। তাহারা জীবিকার্জনের চেষ্টায় ঘরের বাহিরে আসিয়াছে পরিবর্তিত পৃথিবীর বিভিন্ন ছন্দে নিজদিগকে স্পন্দিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। কেবলমাত্র যে আদিম সাংস্কৃতিক রূপরেখা

তাহাদের আদর্শ তাহা নহে। এই পরিবর্তনের জন্য তাহাদের অর্থনৈতিক জীবন যাত্রায় বিভিন্ন সংস্কৃতির ঢেউ আসিয়াছে। ভারতবর্ষের বর্ণভেদ প্রথা (Caste system) চিন্তা করিলে ঐ একই কথা, কেননা পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক পরিবেশ আর নাই। কৌলিক বৃত্তি বর্তমানের মানুষকে আর আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না। তাহা ছাড়া বর্তমান অবস্থায় জাতির ও দেশের সর্বাঙ্গীক উন্নতির দিকে নূতন পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য বহুলোকের কর্মের সংস্থান হইয়াছে। তাহাতে সর্বস্তরের মানুষ যোগ্যতা ও দক্ষতা লইয়া জীবিকার্জনের পথ খুঁজিয়া পাইতে চেষ্টা করিতেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় উপজাতিদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা আলোচনা করিলে আমরা নানা পরিবর্তন দেখিতে পাইব।

সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রম বিকাশের কথা চিন্তা করিলে আমরা 'খাদ্যান্বেষণ' (Eood gathering)-কে আদিম বৃত্তি বলিয়া ধরিব। আন্দামান দ্বীপের আন্দামানী, জারাওয়া, ওঙ্গে প্রভৃতি উপজাতি এখনও খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। খাদ্য সংগ্রহ বলিতে ফলমূল, পাতা আহরণ অথবা পশুপক্ষি বা মৎস্য শিকার বুঝায়। যেদিন আহার জুটিল সবাই মিলিয়া ভোজন করিল—আবার যেদিন জুটিল না সেদিন তাহাদের উপবাস। এমনিভাবে নিতান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে তাহাদের দিন কাটাইতে হয়। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের উপজাতিগুলি ছাড়া ছোটনাগপুরের বিরহড়, হায়দ্রাবাদের চেনচু (Chenchu), কেরল প্রদেশের কাডার (Kadar)-গণ হইল এই আদিম উপজীবিকায় নির্ভরশীল সম্প্রদায়। অবশ্য কাডার উপজাতির অনেকে শ্রমিকের কাজ পাইয়া জীবন যাত্রার পরিবর্তন আনিতে চেষ্টা পাইতেছে।

পশুপালন (Pastoralism) হইল আর এক ধরণের উপজীবিকা যেখানে সম্প্রদায়গুলি গৃহ পালিত পশুর উপর একান্ত ভাবে নির্ভর করে। ভারতবর্ষে নীলগিরি পাহাড়ের টোডা (Toda) উপজাতিরা মহিষ প্রতিপালন করিয়া থাকে। মহিষের দুগ্ধে তাহারা নানারকম খাদ্য

সামগ্রী তৈয়ার করে, আর প্রতিবেশী বাদাগা (Badaga) বা কোটা (Kota) সম্প্রদায়দের নিকট দৈনন্দিন জীবনের খাদ্য বা বস্তু সামগ্রী পরিবর্তন করিয়া থাকে। আলামোড়া জেলার ভোট (Bhot) বা ভোটিয়ারা বৎসরের কিছুদিন পশুচারণ ও কিছুটা কৃষিকার্য করিয়া দিন কাটায়। তাহারা বৎসরের বিভিন্ন সময়ে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। মেলা বা বাজারে গিয়া গৃহস্থালীর সরঞ্জাম কিনিয়া আনে।

কৃষিকার্য (Agriculture) হইল আর একটি অর্থনৈতিক স্তর। যাহার মাধ্যমে বিভিন্ন উপজাতি বা সম্প্রদায় স্থায়ীভাবে বাস করিতে পারে। আবাদী জমির আশে পাশে তাহাদের গ্রাম বা আস্তানা গড়িয়া উঠে। কৃষির আবার তারতম্য রহিয়াছে। উন্নত ধরণের প্রথায় সমস্ত উপজাতি সমাজ সমানভাবে অভ্যস্ত হইতে পারে নাই। আদিম প্রথায় কৃষিকার্য বা 'বন্যপ্রথায় চাষ' (Shifting Hill Cultivation) দ্বারা বহু উপজাতি জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। পাহাড়ের পাদদেশে একটানা প্রশস্ত মাঠ পাওয়া যায় না, তাই বন জংগল পরিষ্কার করিয়া আবাদ করিতে হয়। এই আবাদের জন্য কুড়াল (Axe) আর কোদালি (Hoe) বা খন্তা (Spade)-এর প্রয়োজন হয়। শীতের শেষে জংগল কাটিয়া তাহাতে আগুন দেওয়া হয়, বর্ষার প্রাক্কালে বীজ বুনিয়া দেওয়া হয়। বর্ষার শেষে ফসল উঠিয়া যায়। এই রকম বুনো চাষের মাঠ দুই তিন বৎসর একসংগে আবাদ করা চলে। তাহার পর নূতন জংগল কাটিয়া আবার ঐরকমে চাষাবাদের কাজ চলে। আসামের নাগা বা কুকিরা এই চাষকে জুম (Jhum) চাষ বলে, মধ্যপ্রদেশের গন্দ উপজাতিরা দাহিয়া (Dahia) বলে, উড়িষ্যার খন্দ উপজাতিরা বলে পদু (Podu), বাস্তার অঞ্চলের মারিয়া (Maria)-রা বলে পেণ্ডা (Penda) এবং বাইগারা বলে বেওয়ার (Bewar)। এই ধরণের চাষে ভরণপোষণের জন্য কুড়ি/তিরিশ জন লোকের এক বর্গমাইল স্থান দরকার যদি তাহারা শিকার বা খাদ্যসংগ্রহের দ্বারা কিছু কিছু খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করিতে পারে।

বুনোচাষ ব্যতীত লাঙল চাষের দ্বারা সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ প্রভৃতি উপজাতি জীবিকার্জন করিয়া থাকে। লাঙল চাষের জন্য একটানা বিরাট সমতল মাঠ না পাইলে আল বাঁধ দিয়া স্তরে স্তরে (Terrace) চাষ করা হয়।

একেবারে শিল্পের উপর নির্ভর করিয়া প্রায় কোন উপজাতি গোষ্ঠী নাই। তবে অনেকে প্রধান উপজীবিকার ফাঁকে তাঁতের কাজ, অথবা অন্য কোন কাজ করিয়া অর্থার্জনের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। করোয়া (Korowa) বা আগারিয়া (Agaria) লোহার কাজ করিয়া থাকে। নাগা ও খাসিয়ারা তাঁতের কাজ করিয়া থাকে। থারু (Tharu)-রা কাঠের ও দড়ির কাজ করিয়া থাকে।

শিল্পপ্রসারণের ফলে অথবা নগর সভ্যতার দ্রুত পরিবর্তনের জন্য নানাবিধ কল কারখানা, চা-বাগান, বা শহরের বিভিন্ন কাজে বহু শ্রমিকের প্রয়োজন হইতেছে। উপজাতি অঞ্চল হইতে এই সকল শ্রমিক আসিয়া ভীড় করিতেছে। আসামের চা-বাগানে মুণ্ডা, ওরাওঁ, সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতির সংখ্যা অধিক। এ ছাড়া রেলের কাজে, করপোরেশনের ধাঙড় প্রভৃতির কাজের জন্য বহু উপজাতি গোষ্ঠী আসিয়াছে। এই সমস্ত জীবিকার্জনের পথ ছাড়া কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্ন উপজাতির সম্প্রদায় কখনও সাপ খেলাইয়া, ভেল্কী-নাচ দেখাইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুর অঞ্চলে কাকমারা (Kakamara) বলিয়া যে যাযাবর সম্প্রদায়ের গোষ্ঠী আছে তাহারা এখনও এইভাবে দিন যাপন করিয়া থাকে।

খাত্ত-সংগ্রহকারী গোষ্ঠী—আন্দামানী

স্মষ্টির প্রথম হইতে মানুষ বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রাকৃতিক খাত্ত সমুদয় আহরণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছে। প্রাকৃতিক খাত্ত বলিতে আমরা নানাবিধ ফলমূল, শাকসব্জীকে যেমন বুঝিয়া থাকি, তেমনি পরিপার্শ্বিক পশুপক্ষী ও মৎস্য প্রভৃতি জলাশয়ের প্রাণী বুঝিয়া থাকি। আদিম জীবন যাপনের রীতি বলিতে খাত্ত সংগ্রহ বা খাত্ত আহরণের বিভিন্ন কলা কৌশল বুঝায়। দীর্ঘদিন মানুষ এই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই, তাহার প্রয়োজনও মিটে নাই ; তাহার জীবন যাত্রায় নিশ্চয়তা আসে নাই। তাই যুগে যুগে নিরন্তর প্রয়োজনের তাগিদে মানুষের সংগ্রামমুখী প্রচেষ্টার নানা রূপায়ন ঘটিয়াছে—কোথাও হয়ত মানুষ পশুপালন করিয়াছে আর কোথাও হইয়াছে কৃষিজীবী। বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিনে মানুষের জীবিকার্জনের আদিম পদ্ধতি কোথাও কোথাও অপরিবর্তিত রহিয়াছে এমন উদাহরণ ও বিরল নয়। সেই সমস্ত সম্প্রদায়ের জীবন ও সংস্কৃতি যেন অচল অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরাই হইল তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাহাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা, সামাজিক জীবনপ্রবাহ, ক্রিয়াকাণ্ড ও ধর্মবিশ্বাস বুঝিবার পূর্বে আন্দামান দ্বীপ-পুঞ্জের প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক পরিচয় জানা উচিত।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ :—হুগলী নদীর মোহনা হইতে প্রায় ৫৯০ মাইল ঈষৎ দক্ষিণ পূর্বে বঙ্গোপসাগরে এই দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। মাদ্রাজের উপকূল হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৭০০ মাইল। ইহার ১২০ মাইল উত্তরে ব্রহ্মদেশের নেগ্রাইল অন্তরীপ, আর ৩৪০ মাইল দক্ষিণে সুমাত্রা। প্রায় ২০৪টি ক্ষুদ্রবৃহৎ দ্বীপ লইয়া এই দ্বীপমালা গঠিত। ইহার মোট আয়তন ২,৫০৮ বর্গমাইল। সমুদ্রে নিমজ্জিত পর্বত শ্রেণীই হইল এই দ্বীপমালা। পাহাড়গুলির উচ্চতা ও খুব বেশী নয়।

সর্বোচ্চ শৃঙ্গ স্যাডল হইল ৩,৪০২ ফুট। এই দ্বীপমালাকে মোটা-মুটি দুইটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—বৃহৎ আন্দামান ও ক্ষুদ্র আন্দামান। বৃহৎ আন্দামানকে আবার চারিটি অংশে ভাগ করা যায়, উত্তর-আন্দামান, মধ্য-আন্দামান, বারাতং ও দক্ষিণ-আন্দামান। বৃহৎ আন্দামান হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণে ক্ষুদ্র আন্দামান অবস্থিত। বৃহৎ আন্দামান দৈর্ঘে ১৬০ মাইল আর প্রস্থে প্রায় ২০ মাইল। ক্ষুদ্র আন্দামান দৈর্ঘে প্রায় ২৬ মাইল আর প্রস্থে ১৬ মাইল।

সমস্ত দ্বীপপুঞ্জ ১০° হইতে ১৫০° অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত। বিষুব রেখার নিকটবর্তী বলিয়া সমস্ত দ্বীপমালা নিরক্ষীয় অরণ্যে আবৃত। জল বায়ু উষ্ণ ও আদ্র। মে মাস হইতে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত হইল ১৫০″ ইঞ্চি। মাঝে মাঝে এই অঞ্চল প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝা ও ঘুর্ণিব্যাত্যায় পীড়িত হইয়া থাকে।

আন্দামানের উপকূলভাগ ভগ্ন। ইহার মধ্যে কোন সুপ্রশস্ত নদী নাই। পাহাড়র গা চিরিয়া কতকগুলি অগভীর জলধারা সমুদ্রের খাঁড়িতে গিয়া পড়িয়াছে। উপকূল ভাগের গড়ন মহিমায় আন্দামান একটি স্বাভাবিক পোতাশ্রয়। উপকূল ভাগে মাত্র দুইটি ভাল বন্দর রহিয়াছে—একটি পোর্ট ব্লেয়ার, অপরটি কর্ণওয়ালিশ বন্দর।

এখানের জীবজন্তুর মধ্যে বন্য শূকর হইল প্রধান। ইহা ছাড়া নানা প্রকারের বন্য বিড়াল, বন্য ইন্দুর, বাদুড় ও নানা প্রকারের সর্প আছে। সরস্থপ জাতীয় গোধিকা বড় আকর্ষণীয়। নানা রকমের পাখি এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ কোল ব্রুক ও ব্লেয়ার নামে দুইজন সাহেবকে আন্দামানের তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। ইংরাজেরা ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে একটি উপনিবেশ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের জন্য একটি অপরাধী উপনিবেশ আন্দামানে স্থাপিত হয়। সেইসব অপরাধীদের বংশধরেরা একটি স্থানীয় সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু আন্দামানের আদিম বাসিন্দাদের উপর এই সব বহিরাগত সংস্কৃতির এমন কোন উল্লেখ যোগ্য সাংস্কৃতিক প্রভাব নাই।

আন্দামানের আদিম বাসিন্দাদের পৃথিবীর একটি প্রচীনতম মানব গোষ্ঠীর এক শাখা বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহারা ক্ষুদ্রকায়, কৃষ্ণবর্ণ, বেশ হৃষ্টপুষ্ঠ বলিষ্ঠ চেহারার লোক, মাথায় চুল কাল ও কোঁকড়ান। ঠোঁট বেশ পুরু। দেহেমুখে চুল প্রায়ই নাই বললেই হয়। আন্দামানের এই মানব-গোষ্ঠীকে নিগ্রোবটু (Negroid) বলিয়া নৃতত্ত্ববিদেরা অভিহিত করিয়া থাকেন। এই মানবগোষ্ঠী কি ভাবে যে এই দ্বীপে প্রবেশ করিল তাহা লইয়া নানা রকম মতভেদ রহিয়াছে।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এই একই জাতির লোক বসবাস করিলেও প্রকৃত পক্ষে তাহারা অনেকগুলি উপজাতি বা খণ্ডজাতি (Tribe)তে বিভক্ত। এই খণ্ডজাতিগুলির ভাষা এবং সাংস্কৃতিক জীবনে বেশ কিছুটা প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের দুইটি প্রধান গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়—বৃহৎ আন্দামান গোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র আন্দামান গোষ্ঠী। বৃহৎ আন্দামানের গোষ্ঠীকে পুনরায় দশটি পৃথক খণ্ডজাতিতে এবং ক্ষুদ্র আন্দামানের গোষ্ঠীকে তিনটি খণ্ড জাতিকে ভাগ করা যায়। এই প্রত্যেকটি খণ্ডজাতির ভাষা পৃথক, সাংস্কৃতিক জীবনে ও অনেক তারতম্য রহিয়াছে। এই ভাষাগুলির পৃথক পৃথক স্থানীয় নাম রহিয়াছে।

সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচহাজার। নানা কারণে বহু খণ্ডজাতির সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। ক্ষুদ্র আন্দামানের ওঙ্গে (Onge) বা জারাওয়া (Jarawa)দের সংখ্যা বেশী। জারাওয়ারা খুব হিংস্র স্বভাবের। এই সমস্ত খণ্ডজাতির মধ্যে মাঝে মাঝে বাদ বিসম্বাদ ঘটিয়া থাকে।

আন্দামানের অধিবাসীরা চাষবাস বা কোন প্রকারের কৃষিকার্য জানে না। ইহাদের এমন কোন গৃহপালিত জন্তু নাই যাহার দ্বারা জীবিকার্জনের কোন সুবিধা হয়। অতি আদিম অবস্থা হইতে ইহারা খাদ্যসংগ্রহ, পশুপক্ষী ও মৎস্যশিকার করিয়া দিন কাটায়। এইভাবে

জীবিকার্জনের জন্য তাহাদের স্থানীয় আহার্য বস্তুর উপর নির্ভর করিতে হয়। আহার্য বস্তুর অনুসন্ধানে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে হয়। সেইজন্য যাযাবরের মত স্থান পরিবর্তন এই গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য। এই যাযাবর বৃত্তি (Nomadic)র মধ্যেও শ্রমের তারতম্য রহিয়াছে। ছোট ছোট শিশুও নারীবা স্থানীয় অঞ্চলের ফলমূল ও শাক-সব্জী সংগ্রহ করে জ্বালানী কাঠ-আনা, জল-আনা, ঝুড়ি-বোনা প্রভৃতি হইল গৃহস্থালীর ছোটখাট কাজ, যাহা নারীদের সাধারণতঃ করিতে হয়। দুর্গম অরণ্য মধ্যে দুঃসাহসিক শিকার, দূরপাল্লার শিকার, সমুদ্রগর্ভে মৎস্য সংগ্রহ ইত্যাদি পুরুষদের কাজ। খাদ্য আহরণের জন্য শিকারীদের দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। সুতরাং যাযাবর বৃত্তির মধ্যে কয়েকটি পরিবারকে সংঘবদ্ধ হইয়া থাকিবাব বিশেষ প্রয়োজন ইহাদের সমাজ-জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়।

সমুদ্রের উপকূলে নানাপ্রকার সামুদ্রিক মৎস, কচ্ছপ, চিংড়ি, কাঁকড়া, শামুক প্রভৃতি পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। কেবল সমুদ্রের উপকূলে নহে, খাঁড়ির মধ্যেও তাহাদের পরিমাণ নিতান্ত কম নহে। আন্দামানীরা তাহাই সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই সব মাছ বা সামুদ্রিক প্রাণী সংগ্রহের জন্য তাহাদের ছোট ছোট জাল আছে। তীর ছুঁড়িয়া মৎস শিকার ইহাদের আর এক বিশেষ রীতি। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জে বুড়াবালং নদীতে অনেক সময় সাঁওতালদের এইভাবে তীর ছুঁড়িয়া মৎস্য শিকার করিতে দেখা যায়। কখনও বা দলবদ্ধভাবে ডোঙ্গা বা শালতি (Canoe)তে করিয়া মৎস্য শিকারের জন্য কূলে-উপকূলে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহা ছাড়া 'জিগ' (Jig) নামে এক রকম কোঁচ জাতীয় বল্লম আছে যাহার সুঁচল বাঁশের ফলা রহিয়াছে। মাছ দেখিতে পাইলেই সেই বল্লম নিক্ষেপ করে। ইহারা কখনও কখনও বন্য গাছের রসকে জলে মিশাইয়া দিয়া জলকে দূষিত করিয়া তুলে। তাহাতে মাছেরা শ্বাসরুদ্ধ হইয়া জলের উপরে ভাসিয়া উঠে। তখন খালি হাতে তাহাদের ধরিয়া উপরে তোলা হয়। ঋতুভেদে শিকারেরও তারতম্যও ঘটিয়া থাকে।

জীবজন্তু শিকারের জন্য তাহাদের বল্লম বা বর্শা আছে। বর্তমানে বর্শার ফলক লৌহের তৈয়ারী হয়। বহু পূর্বে প্রস্তরের ফলক দিয়া ঐ ফলক নির্মিত হইত। বন্য জন্তুর মধ্যে শূকর শিকারই হইল প্রধান। ইহারা শূকরের পায়ের চিহ্ন দেখিয়া তাহাদের অবস্থিতি জানিতে পারে। তখন দলের সকলে মিলিয়া জঙ্গল ঘেরাও করিয়া তীর ধনুক বা বল্লমের সাহায্যে শিকার করিয়া থাকে। শূকর ছাড়া বন্য বিড়াল গিরগিটী গোধিকা, কোন কোন জাতের সর্প বা ইন্দুর, শিকারের বস্তু বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। বর্তমানে আন্দামানীরা কুকুর প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সব পোষা কুকুরগুলি বন্য জন্তুর সন্ধান পাইলে দৌড়াইয়া যায় এবং শিকারের গন্তব্যস্থানের সংকেত দিয়া থাকে। শিকারের পর আগুণ জ্বালাইয়া প্রাণীটিকে ঝলসাইয়া লওয়া হয়। পরে পেটের নাড়িভুঁড়ি বাহির করিয়া সেইখানে ভোজন সারিয়া লয়। তাহার পর টুকরা টুকরা করিয়া পাতার মোড়কে মাংসখণ্ডগুলি বাঁধিয়া লইয়া আস্থানায় ফিরে। পক্ষীশিকারে ইহাদের তেমন আগ্রহ নাই। গাছ হইতে ফল সংগ্রহ করিবার জন্য আন্দামানীরা আঁকশি ব্যবহার করিয়া থাকে। কাঠের খন্তার দ্বারা মাটির নীচেকার মূল সংগৃহীত হয়। বর্ষাকালে নানা প্রকার শাক-সব্জী এই সব অঞ্চলে পাওয়া যায়।

মধু সংগ্রহ আন্দামানীদের আর এক প্রয়োজনীয় খাদ্য আহরণের রীতি। মধুপানে ইহাদের শরীর ভাল থাকে। কখনও বা মধু পচিয়া এক রকম মদে পরিণত হয়। তাহাও খুব উপাদেয়। মধুর চাক হইতে মধু সংগ্রহের সময় এক প্রকার পাতা চিবাইয়া সারাদেহ মাখিয়া থাকে। তাহার জন্য মৌমাছি হুল ফুটাইতে পারে না। কখনও বা চামড়ার থলিতে মধু ভরিতে থাকে।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আস্থানাগুলিতে কর্মচাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া যায়। পূর্বদিনের সংগৃহীত খাদ্য নিঃশেষ করিয়া পুরুষেরা দূর পাল্লার শিকারে বাহির হইয়া পড়ে।

মেয়েরা বা ছেলেরা আস্তানার নিকটবর্তী স্থানগুলিতে শাক-সব্জী

বা ফলমূল সংগ্রহ করিতে থাকে। অক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের আগলাইয়া থাকে। শিকার বা খাদ্য সংগ্রহের জন্য তাহাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থান আছে। সাধারণতঃ সেই নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে এক একটি বিশেষ দল বিচরণ করে। অন্য দলের এলাকার মধ্যে এই দল সাধারণতঃ প্রবেশ করে না। কখনও কখনও দুইটি দলের মধ্যে বাদ বিসম্বাদ বা যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিয়া থাকে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে শিকারীর দল তাহাদের আস্থানায় ফিরে। তখন সংগৃহীত খাদ্য এক সঙ্গে জড় করা হয়। রান্নার ধূমধাম পড়িয়া যায়। রান্নার শেষে ভোজনের আয়োজন। বয়োজ্যেষ্ঠেরা শিকারের ভাল অংশ পাইয়া থাকে। এই ভাবে বিতরণ করাকে তাহারা সম্মানের কাজ বলিয়া মনে করে। ভোজনের শেষে নাচগান আরম্ভ হয়। মেয়েরা সারিবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়ায়, তাহারা সামনের দিকে ঝুঁকিয়া তাল দিতে থাকে। কখনও বা বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকে। পুরুষেরা গানের প্রথম অংশ সুর করিয়া বলে—মেয়েরা সমবেত ভাবে তাহার ধুয়া দিতে থাকে। ইহাদের কোন বাদ্য যন্ত্র নাই। পুরুষেরা কাঠের টুকরা বা লাঠি দিয়া শব্দ করে, কখনও বা হাতে হাত দিয়া করতালি দিয়া থাকে। গানের ফাঁকে ফাঁকে উরুতে চাপড় দিয়া শব্দ করিতে থাকে। তাহাদের গানগুলি একঘেয়ে হয়ত কোন শিকার বা ফলমূল সংগ্রহের ঘটনা, ঠিক যেন রূপকথার কাহিনী—সুরের ঝংকার মূর্ত হইয়া উঠে।

নাচ গানের সময় মেয়েরা নানা সাজে সজ্জিত হইয়া থাকে। লাল-পোড়া রং এর সাথে মোম মিশাইয়া দেহে-বুকে, বা নগ্ন কটিদেশে বা পশ্চাদভাগে লেপিয়া লয়। ঝিনুক দিয়া চাঁছিয়া তাহাতে নানা রকমের দাগ কাটিয়া থাকে। তাহা দেখিতে অপরূপ হইয়া থাকে।

কখনও কখনও মেয়েরা ঝিনুক বা গাছের পাতা গুচ্ছাকারে কটিদেশে ঝুলাইয়া রাখে। নাচগান ছাড়া রূপকথা বলার রেওয়াজ তাহাদের মধ্যে আছে। বৃদ্ধেরা তাহাদের অভিজ্ঞতার সংগে রঙীন কল্পনা মিশাইয়া দেয়। কনিষ্ঠরা তাহাকে ঘিরিয়া বিভোর হইয়া গল্প শুনিতে থাকে।

বাসস্থান ও আবাসগৃহ :—আন্দামানী খণ্ডজাতির বৈচিত্র্যময় জীবন যাত্রার জন্য ইহাদিগকে স্থূলভাবে দুইটি দলে ভাগ করা যায়। একটি উপকূলবাসী—যাহারা বেশীরভাগ সময় উপকূলে থাকে। অপরটি অরণ্যবাসী। অরণ্যবাসীদের অপেক্ষা উপকূলবাসীরা বেশী ঘুরিয়া বেড়ায়। কেননা তাহাদের ডোঙ্গা বা শালতি আছে। জীবন যাত্রার সামগ্রীগুলি ডোঙ্গাতে করিয়া বহন করা সহজ। অরণ্যবাসীরা এতখানি যাযাবর নয়। অবশ্য প্রত্যেক দলের নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূখণ্ড আছে তাহার মধ্যে বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে তাহারা সাময়িক শিবির তৈয়ার করিয়া আস্থানা পাতে। ইহা ছাড়া তাহাদের প্রধান বাসস্থান আছে। বর্ষাকালে যখন চারিদিকে জল জমিয়া যায় তখন তাহারা ঐ স্থায়ী বাসস্থানে ফিরিয়া যায়। আন্দামানীদের বাসগৃহগুলির ধরণ হিসাবে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ স্থায়ী যৌথ (Communal hut) ঘর। খুঁটি পুঁতিয়া বৃত্তাকারে এই গৃহের বুনিয়াদ তৈয়ার করা হয়। তাহারা নিজেদের ভাষায় ঐ ঘরকে 'বুদ' বলে। সেই সব যৌথ গৃহের ব্যাস ৬০ ফুট হয় আর কেন্দ্রের উচ্চতা ২০ ফুট হইতে ৩০ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে প্রত্যেক পরিবারের বাসের জন্য ছোট ছোট কয়েকটি কুঠরী থাকে। ফলে যৌথ গৃহটিকে অনেকটা মৌচাকের চাকের মত দেখায়। প্রথমে খুঁটি পোতা হয়। তাহার উপর কাঠামো হয়—কাঠামোর উপর তাল-নারিকেলের পাতা, বা খাগড়া পাতিয়া দেওয়া হয়। লতাপাতা জড়াইয়া ছাউনিগুলি বেশ মজবুত করা হয়।

পুরুষ ও স্ত্রী সকলে মিলিয়া ঘর তৈয়ারীর কাজ করিয়া থাকে। এই ধ.েণর এক একটি যৌথ গৃহ ১০।১২ বৎসর টিকিয়া থাকে।

ইহা ছাড়া আন্দামানীরা সাময়িক বাসগৃহ তৈয়ার করিয়া থাকে। সেই ধরণের ঘরগুলি প্রত্যেক পরিবারের একটি হিসাবে থাকে। অবিবাহিতা মেয়ে বা নিঃসন্তান বিধবারা একই ঘরে থাকিতে পারে। কখনও বিপত্নীক পুরুষ ও আলাদা ঘরে থাকে। ঐ সমস্ত পরিবার-গুলির থাকে একটি করিয়া যৌথ পাকশালা। ঘরগুলি একটি

বৃত্তাকার আঙ্গিনার চতুপার্শ্বে সীমায়িত থাকে। বৃত্তাকার আঙ্গিনা হইল নৃত্যের প্রাঙ্গন, অবসর সময়ে চিত্ত বিনোদনের স্থান। এই রকম কয়েকটি পরিবারের ঘর লইয়া একটি অস্থায়ী শিবির, আস্থানা বা গ্রাম গড়িয়া উঠে। এই সব ঘরগুলির চারিপার্শ্বে থাকে চারিটি খুঁটি। ঘরের সম্মুখের খুঁটি দুইটি বেশ বড়। তাহার উপর খাগড়া বা নলের ছাউনী থাকে—সুন্দর বুননি করিয়া গাঁথা। এই রকম সাময়িক কুটিরগুলি তিন চারি মাসের বেশী ব্যবহৃত হয় না। কখনও বা পরপর পিছন দিকে আটকান থাকে। এই সব অস্থায়ী আবাস ছাড়া—আন্দামানীদের আরও এক রকম হেলান কুটীর (Lean type hut) থাকে। শিকারীরা খাদ্য অন্বেষণের সময় অল্প কয়েক দিন এই ধরণের কুটির তৈয়ার করিয়া থাকে। ঐ রকমের হেলান কুটির তৈয়ার করিতে গাছের কয়েকটি ডাল পালাই যথেষ্ট। কয়েকটি ডাল পালাকে খুঁটি দিয়া হেলান অবস্থায় রাখা হয়। ইহার দ্বারা বাতাস, সূর্যকিরণ বা বৃষ্টিপাত আটকানো সম্ভব হইয়া থাকে।

আন্দামানীরা নানা কারণে তাহাদের বাসস্থান পরিবর্তন করে। খাদ্যান্বেষণ হইল প্রথম কথা। কেননা প্রাকৃতিক পরিবেশে ভক্ষবস্তু যতই দুর্লভ হইয়া পড়ে ততই নূতন জায়গায় তাহাদের খাদ্য অনুসন্ধানের জন্য ঘুরিতে হয়। যদি কোন ব্যক্তির মৃত্যু এই আস্থানায় হয় তবে তাহা পরিত্যক্ত হয়। বাসস্থানের নিকট যখন আবর্জনা পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হয় তখনও আস্থানা পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়।

আন্দামানীদের এই সব সাময়িক শিবিরে ৪০।৫০ জন লোক থাকে অর্থাৎ ৮।১০টি পরিবার।

আন্দামানীদের মধ্যে ব্যাক্তিগত মালিকানা বোধ তেমন নাই। বিশেষ ভাবে ভূমিখণ্ডের উপর গোষ্ঠীর মালিকানা থাকে। তাহা হইলেও কোন একটি গাছ, অথবা কোন মৌচাক যে ব্যক্তি প্রথমে দেখে ও তাহার কাজে লাগিবে বলিয়া জানায়। প্রকৃতপক্ষে উহা তাহারই হইয়া যায়। কোন প্রাণী শিকারের বেলায় যে ব্যাক্তি প্রথমে বন্য শূকর দেখিবে তাহা যে তাহার হইবে এমন নহে। বরং যে তীর-

বিদ্ধ করিবে তাহা তাহারই প্রাপ্য হইবে। ঠিক তেমনিভাবে সমুদ্রে যে কচ্ছপ বা মৎস্য সংগ্রহ করিবে তাহা তাহার নিজের থাকিবে। আমাদের সমাজে যেমন ধনীনির্ধন বা অর্থনৈতিক জীবনের বা মানের স্তরভেদ আছে আন্দামানীদের তাহা নাই। ব্যাক্তিগত শিকারের সম্পত্তি দ্বিধাহীন ভাবে অপরকে বিলাইয়া দিতে কেহ কোন কার্পণ্য করে না। নিজেরা কোন জিনিস উৎপন্ন করে না বলিয়া ব্যক্তিগত মালিকানাবোধ কম। তাহারা প্রকৃতির সর্বপ্রকার দানকে সমান ভাবে সকলের প্রয়োজন মিটাইবার কাজে লাগাইয়া থাকে।

আন্দামানীদের পরিবারে মা, বাবা ও আপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রকন্যা থাকে। বিবাহের পর পুত্র পৃথক সংসার পাতে। কিন্তু সে ইচ্ছা করিলে তাহারা পিতার দল বা গোষ্ঠীতে অথবা তাহার শশুরের দল বা গোষ্ঠীতে থাকিতে পারে। বিবাহের পূর্ব হইতে স্বামী স্ত্রীকে জানে। যাহার ফলে বিবাহের জন্য তাহাদের বেশী খোঁজা খুঁজি করিতে হয় না। নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ হয় না। বিবাহ গোষ্ঠীর মধ্যে বা গোষ্ঠীর বাহিরে হইতে পারে।

পোষ্যপুত্র রাখা আন্দামানীদের আর একটি অদ্ভুত প্রথা। বন্ধু-বান্ধবেরা পরস্পর অপর আর একজনের পুত্রকে পোষ্য নেয়। তাহাদের ধারণা তাহাতে তাহাদের মধ্যে সম্প্রীতি বাড়িবে ও পরস্পরের মধ্যে স্নেহের বন্ধন দৃঢ় হইবে।

আন্দামানীরা শিশুদের ভালবাসে। যে কোন মা অন্য শিশুকে নিজের স্তন্য দিতে ইতস্ততঃ করে না। শিশুরা মা বাবার কাছে থাকিয়া সামাজিক রীতিনীতি বা অন্যান্য অনুশাসন মানিয়া চলিবার চেষ্টা করে। আন্দামানীরা বড়দের বিশেষ শ্রদ্ধা করে। পিতার বয়সী গুরুজনদের পিতৃতুল্য ও মাতার বয়সী গুরুজনদের মাতৃতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকে।

আন্দামানীদের নিজেদের কোন সরকার বা পঞ্চায়েত নাই। গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা যাহার বেশী বয়স সেই নেতৃত্বের আসন পাইয়া থাকে। দয়া, পরোপকার, সাহস প্রভৃতি সদগুণ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই সব

ব্যক্তিদের সবাই অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে এবং সমাজের যে কোন অসুবিধা বা গোলযোগ তাহারাই মিটাইয়া দিয়া থাকে। তাহাদের গাঁয়ে ব্যক্তিগত ব্যাপারে ঝগড়া বা বাদ-বিসম্বাদ বাধিলে প্রৌঢ়া মেয়েরা তাহা মিটাইয়া দিয়া থ কে।

আন্দামানীদের সমাজে অপরাধ খুবই কম। নিতান্ত অধৈর্য হইয়া কেহ কাহাকে নিহত করিলে সে প্রথমে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করে। কিছুদিন আত্মগোপন করিলে অন্যদলের রাগ কমিয়া যায়। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে শত্রুতা চলিলে তাহা দীর্ঘদিন স্থায়ী হইয়া থাকে।

আন্দামানীদের মধ্যে নানাপ্রকার দেবতা বা অপদেবতা আসন পাতিয়া বসিয়া আছে। তন্মধ্যে প্রধান দেবতা হইল বিলিকু ও টেরিয়া। ইহারা মৌসুমী ঝড়ের দেবতা বলিয়া পরিচিত। ঐ সব দেবতারা যাহাতে ঝড় বা ঝঞ্ঝার দ্বারা তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে না পারে সেইজন্য আন্দামানীরা তীরধনুক দেখাইয়া ভয় দেখাইত। তাহাদের ধারণা প্রাকৃতিক প্রতিটি বস্তু নিচয়ের মধ্যে প্রাণ রহিয়াছে। আবার মানুষ মরিয়া গেলে এক প্রকার দুষ্ট ভূতে পরিণত হয়। বনে জঙ্গলে একা মানুষ পাইলে তাহারা তাহাদের ক্ষতি করিতে পারে। এই সব অপদেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহারা নানা প্রকার জিনিস সংগে রাখে। কোন বিশেষ ধরণের কাজ একেবারে করে না। যেমন কিছুতেই তাহারা মোম পোড়ায় না। তাহাদের ধারণা মোম পোড়াইলে ঝড়ের দেবতা রাগিয়া যাইবেন। তাহাদের ধারণা সূর্য হইল চন্দ্রের স্ত্রী। নক্ষত্র হইল তাহাদের সন্তান সন্ততি। এমনি ভাবে নিজেদের বিচার বুদ্ধি দিয়া প্রাকৃতিক বস্তু নিচয়ের মধ্যে অশরীরী শক্তির কল্পনা করিয়া তাহাকে সমাজের কল্যাণে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছে।

কেহ মারা গেলে প্রথমে পুরুষেরা সুর করিয়া কাঁদে। তাহার পর মেয়েরা আসিয়া কাঁদে। পরে মৃতের সর্বদেহে নানা প্রকার রং দিয়া তাহাকে কবর দেয়। কবর দিবার সময় মৃতের মাথাটি পূর্বদিকে রাখা

হয়। তাহাদের ধারণা এইরূপ না করিলে সূর্যদেব আর পূর্বদিকে উঠিবে না। আবার অনেক সময় গাছের উপর চাঙ্গাড়ি তৈয়ারী করিয়া মৃতদেহ রাখিয়া দেয়। কয়েক মাস পরে যখন মৃতদেহ পচিয়া খসিয়া পড়িবে তখন তাহার চোয়াল মাথার খুলি বা অন্যান্য জিনিস শোকার্ত পরিবারের সবাই শোকের চিহ্ন হিসাবে গলায় বাঁধিয়া রাখিবে।

———

পশুপালক গোষ্ঠী—নীলগিরি পাহাড়ের টোডা

দক্ষিণ ভারতে নীলগিরি পাহাড়ের মনোরম পরিবেশে টোডা উপজাতির বাস। পূর্বঘাট আর পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মিলনে এই উপত্যকা। ইহার নৈসর্গিক পরিবেশ অতি মুগ্ধকর। এতদ্ভিন্ন এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ। গ্রীষ্মের প্রখরতা বা শীতের কাঠিন্য কোনটাই প্রকট নয় বলিয়া বহু ভ্রমণকারী এই অঞ্চলে বেড়াইতে আসে। উৎকামণ্ড একটি স্বাস্থ্যনিবাস।

টোডারা পশুপালকের গোষ্ঠী। একমাত্র মহিষ হইল তাহাদের গৃহপালিত পশু। এই মহিষকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন চলে। ইহাদের প্রতিবেশী কয়েকটি উপজাতি রহিয়াছে তাহার মধ্যে বাদাগা (Badaga) আর কোটা (Kota)-ই হইল প্রধান। বাদাগারা কৃষিজীবী গোষ্ঠী, ইহাদের নিকট হইতে খাদ্যবস্তু সংগৃহীত হয় আর কোটারা নানা তৈজসপত্র তৈয়ার করিয়া থাকে। দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত খাদ্যের বিনিময়ে টোডারা তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই দুইটি প্রতিবেশী উপজাতি ছাড়া ইরুলা (Irula) ও করুম্বা (Kurumba) উপজাতির সম্প্রদায় দুইটি ঐ অঞ্চলের জংগলে বাস করিয়া থাকে। করুম্বা উপজাতি নানারকম যাদু (Magic) জানে বলিয়া স্থানীয় জাতি ও উপজাতিরা তাহাদের ভয় করিয়া থাকে। এই সমস্ত জাতি-উপজাতি প্রায় ৫০০ বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া বসবাস করে। টোডাদের সংখ্যা প্রায় ৮০০।

আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে টোডারা নৃবিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। দক্ষিণ ভারতের স্থানীয় জাতি বা উপজাতির সহিত তাহাদের আকৃতির বিশেষ কোন সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহাদের গায়ের রং অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। মুখে দীর্ঘ শ্মশ্রু, নাসিকা

উন্নত ও চোখের গড়ন বেশ দীর্ঘায়াত। জাপানের আইনু (Ainu) দের সংগে ইহাদের গঠনের সাদৃশ্য রহিয়াছে।

পাহাড়ের উপত্যকায় টোডাদের গ্রামগুলি বিচ্ছিন্ন ভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে। এক একটি গ্রামে ৮।১০টি বাড়ী। আবার গৃহপালিত মহিষের জন্যও থাকার স্থান নির্দিষ্ট রহিয়াছে। আবার কিছুদূরে রহিয়াছে চারণ ভূমি। টোডাদের ঘরগুলির ধরণ দুই রকমের। এক রকমের লম্বা বাড়ী—বেশ কয়েক ফুট লম্বা। অনেকটা আমাদের দেশের ধানের গুদাম ঘরের মত। লম্বা ঘরগুলির দেওয়াল বলিতে কিছুই নাই। উপরের চালা গোল হইয়া বাঁকিয়া মাটিতে মিশিয়াছে। তাহাই দেওয়াল। আর দুইপাশ কাঠের তক্তা দিয়া আটকান। এইদিকে দরজা থাকে। ঘরে কোন জানালা নাই বলিয়া অন্ধকার। উপরের ছাউনী কখনও বেত অথবা লতাপাতার হয়। এই লম্বাঘরের দুইটি প্রকোষ্ঠ আছে। একটিতে গৃহস্থালীর কাজকর্ম থাকা-বসা হইয়া থাকে। আর অন্যটিতে তাহারা দুধের কাজ করিয়া থাকে। যে প্রকোষ্ঠটিতে দুধের কাজ করা হয় তাহাতে কোন স্ত্রীলোক প্রবেশ করে না।

টোডাদের আর এক ধরণের গোল পত্তনীর ঘর থাকে। তাহার উপরের আবরণও গোলাকার। ঐ সমস্ত ঘরের পাথরের বেড়া দেওয়া থাকে। তাহাতে মহিষ থাকে।

টোডারা কৃষিকার্য করে না অথবা কোনপ্রকার শিকারেও তাহাদের উৎসাহ নাই। কেবলমাত্র গৃহপালিত মহিষ হইতে তাহাদের জীবন যাত্রার সমূহ প্রয়োজন মিটিয়া থাকে। মহিষ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ পুরুষেরা করিয়া থাকে। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে সেই জন্তুগুলিকে বিভিন্ন চারণ ভূমিতে লইয়া যাইতে হয়। মহিষের পুরুষ বৎসগুলি কয়েকটি দেবতার নামে ছাড়িয়া দেওয়া হয় অথবা আত্মার নামে উৎসর্গ করা হয়। মহিষগুলির কতকগুলি সাধারণের জীবন যাত্রার জন্য নির্দিষ্ট থাকে আর বাকীগুলি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ধর্মানুষ্ঠানের জন্য থাকে। এই বিশেষ উদ্দেশ্যের মহিষগুলি

রক্ষণাবেক্ষণের জন্য টারথার (Tarthar) বা মর্যাদা সম্পন্ন দল হইতে লোক নিয়োজিত হয়। পুরোহিতগণ এই সমস্ত বিশেষ উদ্দেশ্যের মহিষগুলির দুধ গ্রহণ করিয়া থাকে।

প্রতিদিন দুইবার করিয়া দুধ-দোহন হইয়া থাকে—একবার ভোরের দিকে অন্য একবার বিকালের দিকে। মহিষের দুধ হইতে নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য তৈয়ার হয়; বিশেষ করিয়া ননী, মাখন, ঘী, ইত্যাদি। মাটির ভাঁড়ে দুধ থাকে তাহাতে বাঁশের মন্থনদণ্ড ঘুরাইয়া মাখন তৈয়ার হয়। সেই মাখন পুনরায় গরম করিয়া ঘী হয়। কখনও বা মাখন তৈয়ারী করিবার পূর্বে কিছুটা বাসি ঘোল মিশাইয়া দেয়। এইভাবে দুগ্ধজাত দ্রব্য নিজেরা ব্যবহার করে, অথবা বাহিরের লোকের সংগে বিনিময় করিয়া প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করিয়া থাকে। নিজেরা কিন্তু বাসি দুধ খায় না।

টোডাদের প্রধান খাদ্য চাউলকে দুধে সিদ্ধ করিয়া খাওয়া। এতদ্ভিন্ন তাহারা কৃষিজাত শাকসব্জি বা তরকারী আনিয়া রান্না করিয়া খায়। মাছ-মাংস কদাচিৎ খায়। কোন কোন বিশেষ কারণে সম্বর হরিণের মাংস খাইয়া থাকে। অন্য মাংস খাওয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলিয়া গণ্য হয়।

অনেক পূর্বে তাহারা কাঠে কাঠ ঘষিয়া আগুন জ্বালাইত। ইহাদের পোষাক পরিচ্ছদের আধিক্য নাই। নিকটবর্তী হিন্দুদের নিকট হইতে মোটা সুতী কাপড় ক্রয় করিয়া আনে। গায়ে লাল রংয়ের একরকম আলগা বহির্বাস ব্যবহার করিয়া থাকে। মেয়েরা নানাবিধ গহনা বিশেষ করিয়া কানবালা, নোলক ও হার পরিয়া থাকে।

টোডাদের সমাজে দুইটি দল আছে। একটির নাম টারথারল (Tartharol) আর অপরটির নাম টিভালিয়ল (Teivaliol)। টারথার দল মর্যাদা সম্পন্ন। এই দ্বৈতদল কিন্তু একটি অপরটির সংগে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করে না। অনেকটা হিন্দুদের বর্ণ (caste) প্রথার মত। অবশ্য দু'একটি যে বিবাহের উদাহরণ নাই তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই টারথার দলের বারটি গোত্র (clan) আর টিভালিয়লদের

ছয়টি গোত্র। এই গোত্রগুলি বিবাহের সময় অন্যগোত্রের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকে। কেননা একই গোত্রে বিবাহ (endogamy) অত্যন্ত অন্যায়। প্রতি গোত্রের লোকজনদের নির্দিষ্ট চারণভূমি থাকে। প্রতিগোত্রের দুইটি করিয়া বিভাগ আছে, উৎসব অনুষ্ঠানে বিশেষ বিভাগের লোকজন কর্তৃত্ব করিয়া থাকে।

টোডাদের অতি শৈশবে বিবাহ হইয়া থাকে। মেয়ে যখন চার কিংবা পাঁচ বৎসর বয়সের হয় তখন বরের পিতা কন্যাটি পছন্দ করিয়া আসে। ঐ সময় কন্যাকে নূতন বস্ত্রখণ্ড উপহার দিয়া বিবাহের প্রাথমিক অনুষ্ঠান শেষ করিয়া রাখা হয়। যতদিন পর্যন্ত কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় ততদিন সে তাহার পিত্রালয়ে থাকে। এই বিবাহকে তাহারা ম্যাটস্থনি (matchuni) বলিয়া থাকে। তাহাদের সমাজে বহুপতি (Polyandry) প্রচলিত। কোন জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিবাহ করিলে তাহার কনিষ্ঠবা সকলেই স্বামী বলিয়া গণ্য হয়, এমনকি বিবাহের পর যদি স্বামীর পুনরায় ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে সেও স্বামীর মর্যাদা বা অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় না। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের হেরফের লইয়া কোন অসুবিধা হয় না। কন্যা সোমত্ত হইলে তাহাকে স্বামীর বাড়ীতে আনা হয় তখন নানা অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। বহু স্বামী বলিয়া স্ত্রী পালা করিয়া প্রত্যেক স্বামীর সংগে কয়েকদিন একসংগে অতিবাহিত করিয়া থাকে। স্বামীরা যদি পরস্পর ভাই না হইয়া সমাজের অন্য লোক হয় তাহাতেও আপত্তি নাই। এইরকম বিবাহে আসল পিতার পরিচয় লইয়া কোন সমস্যা দাঁড়ায় না। কেননা স্বামীদের মধ্যে যে পিতা হইতে চায় সে গর্ভবতী স্ত্রীকে লইয়া একটি অনুষ্ঠান করে। সেই অনুষ্ঠানে অন্যান্য স্বামীরা উপস্থিত থাকে, তীর ধনুক, প্রদীপ ইত্যাদি উপকরণ লাগে। অনুষ্ঠানের নাম পুরুস্থৎপুমী (Pursutpumi or Bow and arrow ceremony). এই অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তি আইনসঙ্গত পিতা বলিয়া সমাজে পরিচিত হয়। এমন কি যদি ঐ অনুষ্ঠানকারী পিতা আকস্মিক ভাবে মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং অন্য কোন স্বামী

'পুরস্যুৎপুমী' অনুষ্ঠান সম্পন্ন না করিয়া থাকে তবে মৃত ব্যক্তির নামে সন্তান সন্ততিরা পিতৃ পরিচয় দিয়া থাকিবে।

এই ধরনের বহুপতি বিবাহের কারণে রহিয়াছে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যার তারতম্য। টোডাদের মধ্যে স্ত্রীর সংখ্যা পুরুষদের চাইতে অনেক কম। ইহার প্রধান কারণ টোডারা শিশুহত্যা বিশেষ করিয়া কন্যাহত্যা (Female infanticide)-কে এক সামাজিক কর্তব্য বলিয়া মনে করিত। বর্তমানে এই কুপ্রথা রহিত হওয়ায় সমাজে পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যা মোটামুটি সমান হইতে চলিতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া বহুপতি বিবাহ সমাজ হইতে রহিত হইয়া যায় নাই। যেহেতু তাহারা বহুপতি বিবাহ করিয়া থাকে এবং সেই সংস্কার তাহাদের মনে বদ্ধমূল, সেজন্য কয়েকজন ভ্রাতা একই সংগে কয়েক-জন কন্যাকে বিবাহ করিয়া থাকে। তাহা দেখিতে যৌথ বিবাহ (group marriage) এর মত। স্ত্রী বন্ধ্যা, অলস অথবা কলহপ্রিয়া হইলে স্বামীরা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। আবার কোন স্ত্রী মারা গেলে স্বামীরা বিপত্নীক হইয়া যায়। তখন তাহারা সুবিধামত আর একজনের পরিবারে স্বামী হইতে চায়। ইহার ফলে বিপত্নীক ব্যক্তিকে মহিষ বা অর্থ সম্পত্তি দিতে হয়।

টোডাদের বিবাহে স্বামী ও স্ত্রী পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট থাকে। কেননা তাহারা মাতুলকন্যা (Mother's Brother's Daughter—M. B. D.) অথবা পিতৃস্বসাকন্যা (Father's Sister's Daughter—F. S. D) বিবাহকে বাঞ্ছনীয় বিবাহ বলিয়া মনে করে। যে সমাজে এই ধরণের আত্মীয় বা জ্ঞাতি (Cousin) বিবাহ অনুমোদিত তাহাদের স্বামী-স্ত্রী (Spouses) পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট থাকে।

টোডারা সামাজিক অনুশাসন কার্যকরী করিবার জন্য অথবা নিয়ম শৃংখলা রক্ষা করিবার জন্য নিজেদের এক সরকার গঠন করিয়া থাকে। এই সরকারকে তাহারা নায়েম (Naim) বলিয়া থাকে। ইহার পাঁচজন মুখ্য মাতব্বর থাকে। এই পাঁচজন বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকে। টারথারল দল হইতে

তিনজন, টিভালিয়ল হইতে একজন এবং বাদাগাদের মধ্য হইতে একজন। এই ধরণের পঞ্চায়েতের গড়ন অন্যান্য উপজাতি সমাজে সচরাচর দেখা যায় না। এই পঞ্চায়েত গোত্রগুলির বাদবিসম্বাদ অথবা পারিবারিক কলহ নিষ্পত্তি করিয়া থাকে। উৎসব বা পার্বণের ব্যয় বরাদ্দ করা তাহাদের কাজ। টোডাদের ভিতর খুন, রাহাজানি প্রভৃতি সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ প্রায় নাই বলিলেই চলে।

মৃতের সৎকার করিবার জন্য তাহারা মৃতদেহকে শশ্মান ভূমিতে লইয়া যায়। মৃতদেহের উপর নূতন কাপড়ের আচ্ছাদন দিয়া থাকে। খাদ্য, বস্ত্র, গহনা ইত্যাদি মৃতের ব্যবহৃত জিনিসপত্র ঐ সংগে লইয়া যায়। সৎকারের সময় দুইটি মহিষকে বলি দেওয়া হয় কেননা ঐ মহিষ দুইটি মৃত্যুর পর আত্মাটিকে নানাভাবে সেবা করিতে পারে বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস। চিতা প্রজ্জ্বলিত করিবার পূর্বে তাহাতে অনেক সময় ঘী ঢালিয়া দেওয়া হয়, মৃত ব্যক্তির মাথা হইতে চুলের গোছা কাটিয়া রাখা হয়। প্রথমবারের সৎকারের কয়েক মাস পর দ্বিতীয়বারে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাহাতে মৃত ব্যক্তির চুলের গোছা এবং দগ্ধাস্থি দিয়া চিতা সাজান হয়। চিতা সাজাইবার পূর্বে পাথরের নুড়ি দিয়া মণ্ডল তৈয়ার হয়। টোডাদের বিশ্বাস মৃত্যুর পর আত্মা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ায়। যখন ইহা স্বর্গে যায় ও সেখানে ইহলোকের মত জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। তবে স্বর্গে কোন দুঃখ কষ্ট বা অশান্তি নাই বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস।

টোডারা নানারকম ভূতপ্রেত ও দেবদেবীতে বিশ্বাস করিয়া থাকে। তাহাদের মতে—'টিয়েকজ্রী' (Tiekzri) হইল সার্বভৌম দেবতা। ইহা ছাড়া আরও বহু দেবদেবী রহিয়াছেন যাঁহারা মানুষ, মহিষ, ও প্রাকৃতিক বস্তুনিচয় সৃষ্টি করিয়াছেন। টোডারা রোগ-ব্যাধি, মৃত্যু, আকস্মিক বিপদ প্রভৃতিকে দুষ্ট ভূতের কাজ বলিয়া জানে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য ভবিষ্যৎগণনাকারীকে ডাকায়। তাহারা ক্রিয়াকাণ্ড বা 'তুক তাক' করিয়া থাকে। বর্তমানের এই টোডা উপজাতির মধ্যে নানাবিধ সংক্রামক যৌন ব্যাধি ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বন্য প্রথায় কৃষক গোষ্ঠী ঃ পুরুমকুকি

ভারতবর্ষে এখনও যে সব গোষ্ঠী অতি আদিম বা বন্য প্রথায় কৃষিকার্য করিয়া থাকে পুরুমকুকিরা হইল তাহাদের অন্যতম। পুরুমকুকিরা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের মণিপুর রাজ্যে বাস করিয়া থাকে। তাহাদের মোট সংখ্যা প্রায় চারিশত।

মণিপুর রাজ্যটি প্রায় ৮,০০০ বর্গমাইল জুড়িয়া বিস্তৃত। এই পার্বত্য অঞ্চলটি প্রায় ২৫০০ হাজার ফুট সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে উচ্চ। এই উপত্যকায় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ী নদী রহিয়াছে। নদীর কিনারে কিনারে কিংবা পাহাড়ের উপত্যকায় অরণ্য রহিয়াছে। তাহাতে উৎকৃষ্ট ধরণের বিশেষ কোন ভাল বৃক্ষ নাই, তবুও নানাপ্রকার বৃক্ষাদিতে এই অঞ্চল পরিপূর্ণ। বাঁশের জংগল আর বিরাট বিক্ষিপ্ত গুল্ম হইল এই অঞ্চলের বিশেষত্ব। আবার এই জংগলে নানাবিধ বন্য জন্তু বিশেষ করিয়া ভল্লুক, হরিণ, বন্যশূকর প্রভৃতির আধিক্য দেখা যায়।

পুরুমকুকিরা মাত্র চারিটি গ্রামে বাস করিয়া থাকে। অনেক দিন পূর্বে তাহারা একটি গ্রামে বাস করিত। ধীরে ধীরে পার্শ্ববর্তী গ্রামে গিয়া তাহারা বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আসামের এই সীমান্তবর্তী অঞ্চলে যে সব কুকি গোষ্ঠীর বিভিন্ন সম্প্রদায় বাস করে তাহাদিগকে মোটামুটি দুইটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি বিভাগ হইল পুরাতন বা আদিম কুকি গোষ্ঠী, অপরটি হইল নূতন বা নয়া কুকি গোষ্ঠী। আদিম কুকি গোষ্ঠীর মধ্যে আইমল, আনাল, চিরু কোলহেন, কোম, লাম্বাং ও পুরুমরাই প্রধান। আর নূতন কুকি গোষ্ঠীর মধ্যে কেবলমাত্র থেডাস (Thadeus) খণ্ডজাতিই প্রধান এবং তাহারা কাছাড়, নাগাপাহাড়, মনিপুরে বাস করিয়া আসিতেছে।

আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে তাহারা মঙ্গোলীয় (Mangoloid) দলের

অন্তর্ভুক্ত। দেহের রং পীতাভ, চোখের গড়ন ঋজু ও মাথার চুলের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ।

পুরুমরা চারিটি গ্রামে বাস করে, ইহারা সচরাচর অন্য কোন খণ্ডজাতি বা সম্প্রদায়ের সহিত বাস করিতে পছন্দ করে না। ইহাদের গ্রামগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে তাহারা একান্ত স্বাধীনভাবে সর্ববিষয়ে এক হইয়া বসবাস করে। কেননা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বা ধর্মানুচরণ বা উৎসব পার্বণে সর্ববিষয়ে নিজেরাই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া থাকে। নূতন গ্রামের পত্তন করিতে হইলে প্রথমে স্থান পছন্দ করে, পরে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ জানিবার চেষ্টা করে। অনুষ্ঠান মনঃপূত হইলে গ্রামে ঘরবাড়ী তৈয়ার হয়। প্রত্যেক গ্রামে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 'নাং চুংরা'-র জন্য একটি দেবস্থান থাকে তাহাকে 'লামান' (Laman) বলা হয়। ইহা ছাড়া গ্রাম্য বৈঠকের জন্য একটি গৃহ থাকে তাহাকে তাহারা রুশাং (Ruishang) বলে। এই দুইটি স্থান গ্রামের সাধারণ কুটিরগুলি হইতে একটু দূরে অবস্থিত। বৈঠক ঘরে তাহারা মধ্যে মধ্যে নাচগানের আয়োজন করিয়া থাকে।

সাধারণতঃ পুরুমদের একটি বাস গৃহ, আর মোরগ ও শূকর রাখিবার ছোট আস্তানা আছে। অবস্থাপন্ন পুরুমরা গোয়াল ও ধান রাখিবার মরাই তৈয়ার করিয়া থাকে। বসতবাটীগুলি লোক সংখ্যা অনুযায়ী ছোট বড় হইয়া থাকে ; তাহারা প্রয়োজন মত 'দোচালা' বা 'চারচালা' বাড়ী নির্মাণ করে। বাঁশের খুঁটি পুঁতিয়া ঘরের আয়তন ঠিক করা হয়। তাহার উপর বাঁশ বাঁধিয়া মজবুত করা হয়। খাগড়া জাতীয় গাছ বা বাঁশের ছিলা বা বেতের চাঁচ দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধা হয়। ঘরের মেঝে উঠান হইতে বেশ কিছুটা উঁচু হইয়া থাকে। ঘরগুলির সাধারণতঃ দুইটি দরজা থাকে, একটি সম্মুখের দিকে আর একটি পশ্চাৎ ভাগে। দেওয়ালগুলির উপর মাটীর প্রলেপ দিয়া বেশ মজবুত করা হয়। ঘরের এক দিকে গৃহকর্তা ও অন্যদিকে অবিবাহিতা সন্তানসন্ততি রাত্রি যাপন করিয়া থাকে।

পুরুমরা কৃষিজীবী সম্প্রদায়। বর্তমানে তাহারা বন্য প্রথায় চাষ (Shifting cultiavation) এবং কোথাও কোথাও লাঙল চাষ (Plough & wet cultivation) করিয়া থাকে। এই বন্য প্রথায় চাষকে তাহারা জুম (Jhum) চাষ বলিয়া থাকে। জুম জমিতে তাহারা ভুট্টা, মকাই, পিঁয়াজ, তিল প্রভৃতি উৎপন্ন করিতে ওস্তাদ। জুম জমিটিতে গোটা গ্রামের লোক একই সংগে চাষ করিয়া থাকে; এলাকা ঠিক রাখিবার জন্য কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক কোন চিহ্ন দিয়া রাখে যাহাতে অন্য গ্রামের লোক তাহাতে দখল দিতে না পারে। যদি কোন কারণে দুইটি গ্রামের মধ্যে দখলী লইয়া বাদ বিসম্বাদ বাধে তখন গ্রামের মাতব্বরেরা সালিশী করিয়া ঠিক করিয়া লইয়া থাকে। এক একটি জুম জমি অত্যন্ত উর্বর হইলে চারি বৎসর পর্যন্ত আবাদী রাখা যায়। তাহার পরে দশ বার বৎসর বাদ দিয়া পুনরায় চাষ করা হয়। গ্রামের কোন ব্যাক্তি একটি জায়গা পছন্দ করিলে পর স্বপ্নের মাধ্যমে জায়গাটি ভাল অথবা মন্দ বুঝিবার চেষ্টা করে। তাহার পর সে যেকোন বৃক্ষ বা অন্য কোন চিহ্ন দিয়া তাহার গ্রামের দখলী কায়েম করিয়া লইয়া থাকে।

জুম চাষের জন্য ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসের দিকে জংগল পরিষ্কার করা হয়। ঐ সময় তাহারা দল বাঁধিয়া কাজ করিতে থাকে, মধ্যে মধ্যে 'হৈ-হো, হৈ-হো' শব্দে নিজেদের শ্রান্তি ভুলিযা উৎসাহ পাইবার চেষ্টা করে। ইহা ছাড়া কাজের অবসরে 'জু' বা দেশী মদ পান করে।

প্রায় মাসাধিককাল জংগলের ঐ গাছপালাকে শুকাইতে দেয়। তাহার পর তাহাতে অগ্নি সংযোগ করে। ঠিক বর্ষার প্রাক্কালে বীজ বুনিবার বন্দোবস্ত হয়। ছোট্ট কোদালি (Hoe) দ্বারা মাটিকে আলগা করিয়া দেয়। বীজের সহিত ছাই মিশাইয়া দিলে ভালরকম গাছ হইবে বলিয়া ঝুড়িতে করিয়া ছাই ও বীজ একই সাথে মিশাইয়া দেয়। বৃষ্টির সংগে সংগে বীজ হইতে চারাগাছ বাহির হয়। প্রায় একমাস পরে ঐ জমি হইতে আগাছা পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করা হয়। জুম চাষের সময় স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে শ্রম করে। পরে যখন গাছ হইতে শিষ বাহির হয় তখন পাহারা দিবার জন্য একটি অস্থায়ী কুটির

ক্ষেতের মাঝখানে নির্মিত হয়। কৃষিকার্যের সংগে নানা দেবদেবীর পূজার ও আয়োজন রহিয়াছে। শীতের আগেই ফসল উঠান হয়। বাতাস দিয়া অথবা মাড়াই করিয়া ফসল পরিষ্কার করিবার পর ঝুড়িতে করিয়া বাড়ীতে জমা করা হইয়া থাকে।

পুরুমকুকিদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী তাহারা বলদ দিয়া লাঙলচাষ করা আরম্ভ করিয়াছে। প্রথমে বীজধান বুনা হইয়া থাকে। তাহার পরে চারাগাছ মাঠে রোপণ করা হইয়া থাকে।

কৃষিকার্যের যন্ত্রপাতি বলিতে প্রথমেই জংগল পরিষ্কার করিবার জন্য একরকম 'দা' আছে। তাহাকে উহারা 'চম' বলে। এই 'দা'ই হইল তাহাদের অতি প্রয়োজীয় যন্ত্র কেননা জংগল পরিষ্কার, হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা এই সবেরই জন্য এই যন্ত্রটির প্রয়োজন হয়। ইহাদের ব্যবহৃত লাঙ্গলটি মণিপুব আঞ্চলের লাঙ্গলের মত। কখনও বা একটি মহিষ বা দুইটি বলদ দ্বারা লাঙ্গল চষার কাজ হইয়া থাকে। বীজ সংগ্রহের জন্য যে 'চেরাং' (cheirung) ব্যবহার করে তাহা দেখিতে অনেকটা হাতার মত।

পুকমদের প্রধান খাদ্য হইল ভাত। ইহাছাড়া তাহারা ভুট্টা, কুমড়া, ও প্রয়োজনীয় তরীতরকারী বাগানে উৎপন্ন করিয়া থাকে। 'জু' বা দেশী মদ নিজেরা তৈয়ার করিয়া থাকে। মদ ও মাংস খাইতে তাহারা ভালবাসে। মাছধরিবার জন্য নানারকম—ঘুনি আছে। শিকারের জন্য তাহারা নানারকম ফাঁদ তৈয়ার করে, তীর-ধনুক দিয়া জীবজন্তুকে আঘাত করে। তাহাদের শিকার করিবার বল্লম ও বর্শা আছে।

পুকম কুকিদেব পাঁচটি প্রধান গোত্র আছে। সেগুলির নাম হইল মারিম, (Marrim), মাকান (Makan), খেয়াং (Kheyang), থাও (Thao) এবং পারপা (Parpa)। আবার পারপা ছাড়া প্রত্যেকটি গোত্রের কয়েকটি করিয়া উপগোত্র আছে। এই গোত্রগুলির বিবাহ সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশেষ বিধান আছে। বিশেষ করিয়া একই গোত্রের পুরুষ ও মেয়ের মধ্যে কোন রকম বিবাহ সম্বন্ধ হওয়া

বাঞ্ছনীয় নয়। বর্তমান উপ-গোত্র (Sub-sib or sub-clan) গুলিও এই নিয়ম মানিয়া চলিতে আরম্ভ করায় এই গুলিও এক একটি বহির্বিবাহকারী (Exogamous) দলে পরিগণিত হইয়াছে। পুরুম-কুকিদের এই সাধারণ নিয়ম ছাড়াও কতকগুলি সুস্পষ্ট বিধান আছে যে কোন কোন গোত্র বা উপগোত্রের সংগে কোন গোত্র বা উপগোত্রের বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। পুরুম গোত্রগুলি পিতৃপ্রধান, পিতার গোত্রানুসারে সন্তানসন্ততির গোত্রের নামকরণ হইয়া থাকে। ইহাদের পাঁচটি গোত্রের মধ্যে—'মারিম' হইল সর্বপ্রধান।

পিতামাতা ও তাহাদের অবিবাহিত সন্তানসন্ততি লইয়া পুরুমদের পরিবার হয়। তাহাদের মধ্যে একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবার প্রায়ই দেখা যায় না। পুরুম কুকিরা পিতৃপ্রধান খণ্ডজাতি। বিবাহের পর স্ত্রী তাহার স্বামীর বাড়ীতে আসে। তখন স্বামী স্ত্রী ক্ষুদ্র সংসারে গৃহস্থালী আরম্ভ করে। কনিষ্ঠ পুত্র মাতাপিতার সংগে দীর্ঘ দিন ধরিয়া থাকে—তাহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য করিয়া থাকে। বিবাহ কালে বর ও কন্যার বয়স যথাক্রমে ২৫ বৎসর ও ১৩।১৬ বৎসর হইয়া থাকে। বিবাহের বয়স হইলে পিতামাতা তাহাদের পুত্রকন্যার জন্য সম্বন্ধ করিয়া থাকে। মনোমত কন্যা পছন্দ হইলে বিবাহের কথাবার্তা ঠিক হয়। শ্রমবিনিময়ে (Marriage by service) বিবাহ তাহাদের এক সনাতন রীতি। ইহার জন্য ভাবী জামাতাকে তাহার শ্বশুর বাড়ীতে খাটিতে হয়। ইহাদের সমাজের বহুপত্নী (Polygyny) বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও সাধারণত দেখা যায় না। কোন কারণে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য হইলে বিবাহবিচ্ছেদ হইয়া থাকে। বিবাহ বিচ্ছেদের সমূহ বৃত্তান্ত গ্রামের মাতব্বরকে জানাইতে হয়। বিধবা বিবাহ তাহাদের সমাজে এক প্রচলিত রীতি। পিতৃপ্রধান সমাজ ব্যবস্থা বলিয়া বিষয় সম্পত্তির মালিক পুত্ররা হইয়া থাকে।

গ্রামের শৃঙ্খলা ও রীতিনীতি ঠিক মত লক্ষ্য করিবার জন্য আটজন মাতব্বর লইয়া একটি পঞ্চায়েত হইয়া থাকে। পঞ্চায়েতের মাতব্বরেরা উত্তরাধিকার বলে পদমর্যাদা পাইয়া থাকে। একজন

মাতব্বর মারা গেলে অথবা কোন কারণে পদত্যাগ করিলে তাহার পদে তাহার পরবর্তী ব্যাক্তি মাতব্বর পদে উন্নীত হইয়া থাকে। নূতন পদে উন্নীত হইবার সংগে সংগে প্রত্যেক মাতব্বরকে একটি প্রীতিভোজ দিতে হয়। এই প্রীতিভোজনে নির্দিষ্ট পরিমাণ শূকর মারিতে হয় এবং কয়েক ভাণ্ড দেশী মদ খাওয়াইতে হয়। গ্রামের ঝগড়াঝাটি ইত্যাদি নিষ্পত্তি করিবার দায়িত্ব তাহারই।

পুরুমকুকিরা নানা দেবদেবী বা ভূতপ্রেতে বিশ্বাসী, নুং চুংবা (Nung Chumba) হইল তাহাদের প্রধান দেবতা। বৎসরে দুইবার তাহার পূজা হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে সম্প্রতি হিন্দু দেবদেবী পূজার প্রচলন হইয়াছে।

পুরুমকুকি সমাজে মৃত্যুকে দুষ্ট প্রেতের কাজ বলিয়া গণ্য করা হয়। মৃত্যুর পর সমাধি দিয়া মৃতের সৎকার করিতে হয়। সমাধির সময় একটি মোরগ ও একটি শূকর বলি দিতে হয়। মৃতের হাতে চারিটি তাম্র মুদ্রা দেবার ব্যবস্থা আছে, কেননা তাহা তাহার পরজগতে যাইবার পাথেয়।

পুরুমকুকিদের জীবন যাত্রা পর্যালোচনা করিলে ইহা সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে তাহারা বন্য প্রথায় জুমচাষ করিয়া জীবন যাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে। এই জুমচাষ প্রথা অত্যন্ত আদিম হইলেও ইহাদ্বারা খুব যে উন্নতি হয় তাহা নহে। কেন না জংগল পরিষ্কারের দ্বারা মূল্যবান কাঠের বাদ বিচার না করিয়া কাটিয়া ফেলা হয়। তিন চার বৎসর চাষের পর ঐ জমি বহুদিন ফেলাইয়া রাখিতে হয়। ফলে নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের জন্য অতি বেশী পরিমাণ জমির আবশ্যক হয়। কৃত্রিম জলসেচের বা সারপ্রয়োগের কোন পন্থা কার্যকরী করা সম্ভব নয় বলিয়া তাহারা ঐ 'জুমজমি' পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন করিয়া থাকে। বর্তমানে দেশের সর্বাত্মক উন্নতির দিনে এই ধরণের আদিম প্রথায় চাষ একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া দেশের অরণ্যসম্পদ বৃদ্ধির দিকে সকলের মনোযোগ দেওয়া উচিত। কেননা অরণ্য ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হওয়ায় বর্ষা, বন্যা প্রভৃতি নৈসর্গিক বিপর্যয় ঘটিতেছে বলিয়া অনেকের অনুমান।

বিভিন্ন উপজীবিকার গোষ্ঠী—ভোটিয়া

আলমোড়া জেলার ভোট বা ভোটিয়া (Bhotiya)-দের জীবন যাপনের পদ্ধতিতে বিভিন্ন উপজীবিকার সংকেত পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশে তাহারা কেমন সুন্দর ভাবে অভিযোজন (adaptation) করিয়াছে, তাহাদের জীবনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করিলে সেই কথা জানা যাইবে।

আলমোড়া হইল উত্তর প্রদেশের কুমায়ুন বিভাগের একটি জেলা। হিমালয়ের কোলে এই অঞ্চলটির পশ্চিমে রহিয়াছে সিমলা, নৈনিতাল, মুসৌরী প্রভৃতি স্বাস্থ্য নিবাস। ইহার উত্তরাংশ মিশিয়াছে তিব্বতের সংগে। পাহাড়পর্বতে বেষ্টিত এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম। গিরিশৃঙ্গ ও উপত্যকা অধ্যুষিত এই অঞ্চল কোথাও বা ২৫ হাজর ফুট উচ্চ। সমগ্র এলাকার আয়তন প্রায় ৫,৩০৮ বর্গমাইল। আলমোড়ার উত্তরপূর্ব অঞ্চলকে বলা হয় ভোট অঞ্চল। দক্ষিণ অঞ্চলের পার্বত্য নদীগুলি ধীরে ধীরে প্রশস্ত হইয়া আসিয়াছে। সমগ্র অঞ্চলের অতি অল্প পরিমাণ স্থানে জন বসতি দেখা যায়। উত্তরাঞ্চলের ভোট অঞ্চলে তিনটি ঋতু দেখা যায়; ফেব্রুয়ারি হইতে জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল, জুন হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বর্ষাকাল আর সেপ্টেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীতকাল। এই শীত ঋতুই দীর্ঘস্থায়ী। শীতের প্রয়ানে বিভিন্ন অঞ্চল লতাগুল্ম, শস্য-শষ্পে এক অপূর্ব নীলিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। পাহাড়ের পাদদেশে অরণ্যাবৃত বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলিকে বলা হয় 'ভবর'। এখানকার বনে ওক, পাইন, রোডনড্রন প্রভৃতি বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। অরণ্যে বন্য হস্তী, গণ্ডার, মহিষ প্রভৃতি জন্তুর উৎপাত রহিয়াছে।

পাহাড়ের গা বাহিয়া নদীর কিনারে অপেক্ষাকৃত উর্বাঞ্চলে গ্রাম

গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার আশে পাশে রহিয়াছে চাষের ক্ষেত। গ্রামের কুটিরগুলির দেওয়াল পাথরের, কখনও বা কাঠের হয়। তাহার উপর খড় বা কাঠের ছাউনী। গোময় ও মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দেওয়া হয়। ভোটিয়াদের আকৃতিতে মঙ্গোলীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য ভোটিয়া অঞ্চলে একটানা সমতল মাঠ বা উর্বর কৃষিযোগ্য জমির অত্যন্ত অভাব থাকায় ঐ জনসমষ্টিকে বিবিধ উপজাবিকায় জীবন যাপন করিতে হয়। প্রথমত তাহারা বন্য প্রথায় কোদালিদ্বারা কৃষিকার্য করে। বাকী কিছুটা নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলে লাঙল দিয়া জমি চাষ করে আর অন্যান্য সময় পশুপালন বিশেষ করিয়া মেষ, গরু প্রভৃতি প্রতিপালন করিয়া থাকে। জমিগুলি উঁচু নীচু, কখনও বা অত্যন্ত খাড়াই বলিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিয়া লইয়া তাহার কিনারে পাথরের নুড়ি বা উপলখণ্ড দিয়া দেয়। তাহাতে তুষার গড়িয়া আসিতে পারে না বা প্রয়োজনের সময় কিছুটা জল আটকাহয়া থাকিতে পারে। এখানের কৃষিকার্যে অনেক বাধা-বিপত্তি আছে। বন্যা, শিলাচ্যুতি বা ধ্বস, আবার বন্যজন্তুর উৎপাত হইল এইখানের স্বাভাবিক ঘটনা। তাই একস্থান হইতে অন্যস্থান পরিভ্রমণ এককথায় অর্ধযাযাবরের বৃত্তি তাহাদের গ্রহণ করিতে হয়।

নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা রহিয়াছে। যেসব খাল দিয়া জল সেচ করা হয় সেগুলিকে ইহারা 'গুল' বলিয়া থাকে। ইহাদের দেশে জোতদার বা বেশী জমির মালিক নাই।

ভোটিয়াদের কৃষিযোগ্য জমিকে মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) 'কাটিল' (Katil) জমি-স্তর (Terrace) চাষের জমি খণ্ডের বাহিরের দিক। ইহা একেবারে অনুর্বর। (২) উপরাঁওন (Upraon) স্তর চাষের খণ্ডবিখণ্ড জমি। ইহাতে জলসেচের কোন বন্দোবস্ত নাই এবং (৩) তালাওঁন (Talaon)— জলসেচের বন্দোবস্ত সহ নদীর সমীপবর্তী উর্বর জমি।

বিভিন্ন জমিতে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে নানা প্রকার ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কাটিল আবদ : এই জমিতে জলসেচের জন্য আল (Ridge) দিবার কোন বন্দোবস্ত নাই। এই সব জমিতে সাধারণতঃ বন্য প্রথায় আবাদ করা হয়। গ্রামের লোকজন শীতের শেষের দিকে এই প্রকার জমি ঠিক করিয়া থাকে। পরে গাছ বা গুল্ম পরিষ্কার করে। ঐ গাছপালা শুকাইলে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। যে সমস্ত ছাই পড়িয়া থাকে বর্ষার পূর্বে তাহা ছড়াইয়া মাড়ুয়া, ছোলা, হলুদ প্রভৃতি বপন করা হয়। বপন করিবার পূর্বে 'কুতলা' বা 'কোদালি দিয়া মাটি চষা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ তিন বৎসর ধরিয়া এই জমি পরপর আবাদ করা হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর বিভিন্ন ফসল উৎপন্ন করা হয় অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে চাষের চেষ্টা করা হইয়া থাকে।

উপরাঁওন আবাদ : এই আবাদ উপরাঁওন জমিতে হইয়া থাকে। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে কখনও খারিপ বা বর্ষাতি-ফসল আর কখনও বা রবিশষ্য, উৎপন্ন হইয়া থাকে। গম চাষের পর 'মাড়ুয়া' চাষ, এইভাবেই কৃষিকার্য চলে। জমিতে অতি পুরাতন ধরণের লাঙল দ্বারা হল-চালনা করা হয়। সেই 'হল' একজন মানুষ চালনা করে, কখনও বা অন্য একজন লোক কোমরে দড়ির সাহায্যে বাঁধিয়া লাঠি ঠুকিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। বীজ বপনের পর যখন দুই তিন ইঞ্চি অঙ্কুর বাহির হয় তখন পুনরায় হলচালনা করিয়া সেগুলিকে ঠিকমত ছড়াইয়া পুনর্বার রোপণ করা হয়। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে আগাছা উঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়। শীতের শেষের দিকে কখনও বা ধানচাষের বন্দোবস্ত হয়। ধানচাষের সময় খাল বা নালা তৈয়ার করিয়া অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

তালাওঁন আবাদ : তালাওঁন জমিতে যেখানে জলসেচের পূর্ণ ব্যবস্থা আছে সেইখানে উন্নত প্রথায় আবাদের কাজ হইয়া থাকে। ঐ অঞ্চলে ধান্য উৎপাদনের জন্য তিনটি ধরণ আছে যথা : (ক) সয়া (Saya), (খ) খাগি (Khagi), (গ) রোপা। সয়া প্রথায় সমস্ত জমিতে একবার মাত্র লাঙল করা হয়। তাহার পর জল প্রবেশ

করানোর ব্যবস্থা থাকে। তাহাতে মাটি প্রায় কাদার মত হইয়া যায়। বীজগুলিকে পূর্ব হইতে সাতদিন জলে ভিজাইয়া অঙ্কুরিত করিয়া লইতে হয়। তাহার পর বপন করা হয়। জুলাই মাসের মাঝামাঝি ঘাস বা আগাছা উঠান হয়। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে গাছে শিষ আসে তখন অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া দিতে হয়। তাহার পরে ধান কাটার কাজ চলে।

খাগি : খাগি প্রথায় চাষে জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী মাসে জমিতে প্রথম লাঙল দিতে হয়। লাঙল করার পর জমিতে বৃষ্টির জল আটকান হয়; যদি বৃষ্টির জল না থাকে তবে নদীর জল দিয়া সম্পূর্ণ মাঠটিকে ৮।১০ দিন ডুবাইয়া রাখা হয়। তখন জমির মাটি বেশ কাদাটে হইয়া যায়—বেশ নরম হয়। তাহার পর অঙ্কুরিত শস্য বপন করা হয়। পরে লাঙল করিয়া মই দিয়া সমান করা হয়। তাহার সাত আট দিন পরে চারাগাছ বাহির হয়। আর বাকি কাজ সয়া প্রথায় চাষের মত হইয়া থাকে।

রোপা : রোপা প্রথায় চাষের বৈশিষ্ট্য হইল প্রথমে চারাগাছ পৃথক জায়গায় তৈয়ার করা। ইহার পর ক্ষেত উত্তমরূপে চষার পর চারাগাছ পুঁতিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর মাঠে ঠিকভাবে জল সেচের ব্যবস্থা রাখিতে হয় এবং আগাছা উঠাইতে হয়।

ফসল সংগ্রহের রীতি সর্বত্রই সমান। ফসল কাটা সাধারণত মেয়েরাই করিয়া থাকে। তাহারা দল বাঁধিয়া কাস্তে লইয়া ধানগাছ কাটিতে থাকে। পরে দুই এক দিনের জন্য—উহা মাঠে শুকাইতে দিতে হয়। পরে মাঠ হইতে আনিয়া খামারে জমা করা হয়। নানাভাবে বিচালি হইতে ধান পৃথক করা হয়। কখনও বা ধানসমেত বিচালি ছড়াইয়া দিয়া বৃত্তাকারে বলদ দিয়া মাড়াই করা হয়, কখনও বা মানুষ মাড়ায় আর কখনও বা কাঠের তক্তাব উপর আঘাত করিলে খড় হইতে ধান ঝড়িয়া পড়ে। পরে কুলার বাতাসে তাহা পরিষ্কার করিয়া থাকে। পাথরের উখুলে কাঠের হাতল দিয়া ধান ভানা হইয়া থাকে। এই কাজ মেয়েরা করে।

পর্বতের পাদদেশে অথবা গাত্রে যে তৃণভূমি তাহা শীতের দিনে তুষারে আবৃত হইয়া যায়। গ্রীষ্মের আরম্ভে প্রচুর পরিমাণে ঘাস জন্মাইয়া থাকে তখন ভোটিয়ারা তাহাদের পশুর পাল লইয়া বৎসরে দুইবার বাসস্থান পরিবর্তন করিয়া থাকে। ঐ সময় তাহাদের সংগে পরিবারের পরিজনবর্গ থাকে। গ্রীষ্মের দিকে উচ্চ শৃঙ্গের নিকটবর্তী বিশেষ করিয়া তিব্বতের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাহাদের গ্রীষ্মকালীন আবাস নির্মিত হয়। ঐ সময় স্ত্রীলোকেরা পশুর পালের দিকে লক্ষ্য রাখে অথবা কম্বল বুনিতে থাকে। পুরুষেরা তিব্বতীয়দের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সম্ভার সংগ্রহ করে। ব্যবসায়ের প্রধান উপকরণ হইল পশম, কম্বল, চামড়া ইত্যাদি। আবার শীতের সংগে সংগে তাহারা নীচে নামিতে আরম্ভ করে।

এই অঞ্চলের পশুগুলির আকৃতি কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র। তাহা হইলেও ইহারা অত্যন্ত কর্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু। পর্বতের সর্পিল পথে এই সব দুগ্ধবতী গাভী যাহাতে পতিত না হয় সেইজন্য রাত্রিকালে বাসস্থানের খুঁটির সহিত তাহাদিগকে শক্তভাবে আটকাইয়া রাখা হয়।

গোষ্ঠযাত্রার প্রাক্কালে গ্রামবাসীরা পূজা-পার্বণ ও উৎসবের আয়োজন করিয়া থাকে। দুর্বল, অসমর্থ, অথবা শিশু বা নারী কোনদিন পশুর পাল লইয়া বাহিরে যায় না। দলের লোকজনদের দুইটি প্রধান করণীয় কাজ: একটি হইল পশুর রক্ষাবেক্ষণ, অপরটি সাময়িক আবাস নির্মাণ। মধ্যে মধ্যে স্থায়ী গ্রাম হইতে লোক আসিয়া পশুপালকদের খোঁজ লইয়া থাকে।

ভোটিয়াদের সমাজ-জীবনে স্ত্রীপুরুষের কাজের দায়িত্ব মোটামুটি সমান। অর্থনৈতিক জীবন যাত্রায় নারীদের অনেক কাজ করিতে হয়। পুরুষদের শক্ত কাজ করিতে হয়। অতিরিক্ত কাজ করিলে কী হইবে? তাহাদের প্রত্যেক কাজের মধ্যে বেশ উৎসাহ বা উদ্দীপনা রহিয়াছে।

ছেলে বা মেয়ের বিবাহযোগ্য বয়স হইলে বিবাহ অনুষ্ঠানাদি হইয়া থাকে। বিবাহে পুরুষ বা স্ত্রীর মত থাকা চাই। তাহাদের মধ্যে বহুবিবাহ (Polygamy) রহিয়াছে। ইহা করিলে কোন ব্যক্তি দুই বা ততোধিক দার পরিগ্রহ করিতে পারে। ভোটিয়ারা পিতৃপ্রধান (Patriarchate) উপজাতি। মেয়েদের পৈতৃক সম্পত্তিতে কোন উত্তরাধিকার বা দাবী নাই। পুরুষের সামাজিক মর্যাদা নারী অপেক্ষা অধিক।

অভূতপূর্ব নৈসর্গিক পরিবেশ, অত্যুচ্চ পর্বতরাজি, তুষারমণ্ডিত শুভ্র গিরিশৃঙ্গ, আর নক্ষত্রখচিত অসীম নীলাকাশ তাহাদের মনের মধ্যে এক স্বর্গীয় কল্পনার রং ছড়ায়। সেই পরিমণ্ডলের মধ্যে দুর্বল, অক্ষম মানুষ অসহায়ের মত চতুর্দিকে এক অশরীরী বা অতি প্রাকৃতিক শক্তির কল্পনা করিয়া থাকে। তাহাদেব মনে হয় চতুর্দিকে যেন সদাজাগ্রত অতি প্রাকৃতিক শক্তির এক ভাস্কর বিকাশ। সেইজন্য তাহাদের জীবনের প্রতিটি মূর্ছনায়, প্রতিটি ছন্দে কুসংস্কার, ভীতি, শঙ্কা জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া রহিয়াছে। তাহাদের ধারণা অতি প্রাকৃতিক শক্তি প্রভাবে বর্ষণ, ঝটিকা ইত্যাদি ঘটিতেছে। তাহারা পশুগুলির শুভাশুভের জন্য নানা দেবতাব অর্চণা করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া তাহারা অনেক উৎসব বা পার্বণ করিয়া থাকে।

মৃত্যুর পর শবদাহ হইল চিরাচরিত প্রথানুযায়ী সৎকার। অন্ত্যেষ্টির পর দগ্ধাস্থি আনিয়া কম্বলে জড়াইয়া গৃহে রাখে।

ভোটিয়া পরিবেশে অর্থনৈতিক জীবনধারা অত্যন্ত তীরতীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য তাহাদের মনে বিরামহীন কর্মোদ্যম প্রতিটি অবস্থার সংগে প্রতিনিয়ত অভিযোজন করিতেছে।

স্থায়ী কৃষক গোষ্ঠী—সাঁওতাল

কৃষিকার্যের দুইটি প্রধান বিভাগ আমরা দেখিতে পাই। একটি হইল বন্য প্রথায় চাষ, আর অপরটি লাঙলচাষ। লাঙলচাষ করার জন্য গরু বা মহিষের প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন হয় একটানা মাঠের। যখনই মানুষ পশুকে তাহার খাদ্যসংগ্রহের কাজে লাগাইতে পারিয়াছে তখনই তাহার জীবনযাত্রায় শ্রমের অনেক লাঘব হইয়াছে। সেইজন্য স্থায়ী কৃষিজীবী গোষ্ঠীর জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও সমাজব্যবস্থার জটিলতা দেখিতে পাই। তাহাদের জীবনে উৎসব বা অনুষ্ঠানের উচ্ছ্বাসময় সাবললীতা আমাদের মুগ্ধ করে। সাঁওতালরা হইল এমনি কৃষিজীবী উপজাতির গোষ্ঠী। সমগ্র ভারতবর্ষের উপজাতিদেব মধ্যে তাহাদের সংখ্যা অধিক। তাহারা প্রধানতঃ পশ্চিম-বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় বাস করিয়া থাকে।

আষাঢ় মাস হইতে ভাদ্র মাস অথবা ফসল উঠাইবার সময় (কাতিক-পৌষ) একদল স্ত্রীপুরুষ লোককে বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। ট্রেণের কম্পার্টমেণ্টে, মোটরে, বাসে তাহাদের সকলকে একসংগে ভীড় করিতে বা ঠেলাঠেলি করিতে দেখা যাইবে। পুরুষদের হাতে তীর-ধনুক, বাঁশের বাঁশী, অথবা ঝাঁকায় থাকে ছোট শিশু। আর স্ত্রীদের মাথায় বাঁশের বাক্স, চাটাই অথবা জীবনযাপনের যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য-সামগ্রী। কত অপ্রচুর ইহাদের দেহাবরণ, কত সামান্য ইহাদের জীবন যাপনের সামগ্রী! তবুও মেয়েরা মাথায় লালফুল গুঁজিয়া একটানা সুরে গান গাহিতে থাকে, যেন সমস্ত জগতের দারিদ্র্যকে তাহারা পরিহাস করিতেছে, ভ্রূকুটি করিতেছে। এই ভীড় আসিয়া জমিবে হাওড়া, মেদিনীপুরের পূর্ব প্রান্তে, ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমানের অবস্থাপন্ন জোতদার

বা কৃষকদের পল্লীতে। ইহা ছাড়া পশ্চিম বাংলার হুগলা, বর্ধমান, ২৪ পরগণা, মালদহ, প্রভৃতি জেলায় ইহাদের স্থায়ী বাসস্থান দেখা যায়। এই যে দুই-মুষ্টি অন্নের জন্য তাহাদের পরিশ্রম, এত যে ব্যাকুলতা তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। এই কাজ করিবার জন্য যখন বাহিরে আসে তাহাকে তাহারা 'নামাল'-এ আসা বলিয়া থাকে।

সাঁওতাল এই নাম মেদিনীপুরের কোন এক পরগণার নাম অনুসারে হইয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা। স্থানীয় লোকজন তাহাদের সাঁওতাল বলিয়া ধরিয়া নেয় কিন্তু তাহারা নিজদিগকে 'হড়' (মানুষ) বলিয়া মনে করে। তাহারা সাঁওতালী ভাষায় কথাবার্তা বলে। ইহা একটি মুণ্ডারী (Mundari) গোষ্ঠীর ভাষা।

সাঁওতাল উপজাতি এককালে অন্য অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া গঙ্গা, শোন প্রভৃতি নদীর উর্বর অববাহিকায় বাস করিত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। তাহাদের রূপকথা বা গানের মাধ্যমে এই ভাবটি অতি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায়।

'গাঙ নাই দ সেকেচ্ সবচ্
নাজিঞ নামার গঁসায় হো
সুড়া নাই দ দরো বোতো নো।'

অর্থাৎ 'দিদিগো গঙ্গানদী কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে। আর শোন নদী উতলা হয়েছে।

এমনি হয়ত এক উর্বর কৃষিক্ষেত্রকে ঘেরা সুখের বাসস্থানকে নানা জাতি-উপজাতির আক্রমণে তাহারা ছাড়িয়া আসিয়া অনুর্বর পাহাড় কংকরময় অরণ্য অঞ্চলে বসবাস করিতে আসিয়াছে। তাহাদের দেহ-মনে কৃষি-সংস্কৃতির পূর্ণ রূপরেণু বিদ্যমান। অনুর্বর অঞ্চলে আসিয়া জংগল পরিষ্কার করিয়া কৃষিক্ষেত্র তৈয়ার করা তাহাদের জীবনচরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ইহারা শান্তিপ্রিয় স্বাধীন গোষ্ঠী। জমির জন্য খাজনা অথবা কোন প্রকার 'কর' দেওয়াকে অন্যায় বলিয়া মনে করিত। তাই জংগল পরিষ্কার করিবার পর জমিদার বা মহাজন শ্রেণী ইহাদের নিকট অর্থদাবী যখনই করিয়াছে তখনই

নানা রকমের সংঘর্ষ হইয়াছে। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধেও ইহারা প্রতিবাদ করিয়াছিল। সেই সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতৃত্ব করিয়াছিল 'সীদো' ও 'কানু'। দুই একটি খণ্ড যুদ্ধে বৃটিশদের পরাজিত করিলেও শেষে তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

সাঁওতালদের গ্রামগুলির এক বৈশিষ্ট্য আছে। তাহারা জংগলের অপেক্ষাকৃত উচ্চ অংশে নিজেদের বসতবাড়ী তৈয়ার করিয়া থাকে। গ্রামের প্রধান রাস্তার নিকটে প্রধান মাতব্বরের বাড়ী। তাহার নিকট থাকে 'মাঝি স্থান'। অন্যান্য বাড়ীগুলি বিক্ষিপ্ত। গ্রামের এক কিনারে 'যাহের স্থান' বলিয়া একটি জায়গা রহিয়াছে। বর্তমানে সাঁওতাল গ্রামে কূপ, ইঁদারা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া স্কুল অথবা ক্লাব-ঘর নজরে পড়ে। একটি বাড়ীর চারিদিকে খানিকটা জায়গায় কিছুটা তরকারী উৎপন্ন করিবার জন্য, কোথাও বা ছোট গোয়াল ইত্যাদি দেখা যায়। বাড়ীর আবার দুইটি ভাগ; একটিতে শয়ন করা হয়, অপরটিতে সাংসারিক জিনিস-পত্র রাখা হয়। তাহাদের 'চার চালা' (Four sloped) বাড়ীগুলি খড়ের ছাউনী। দেওয়াল কী সুন্দর লাল, কাল বা সাদা রং দিয়া অঙ্কন করা। দাওয়াও উঠোন হইতে বেশ উঁচু। তাহাও আবার কাল রং এর। এমনি ভাবে সাঁওতালদের ঘরগুলি দেখিলে অবাক হইতে হয়। অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে তাহারা বাস করিতে ভালবাসে।

ইহারা কৃষিজীবী সম্প্রদায়। ধানই হইলে প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। নিজদিগের গ্রামের আশে পাশে কৃষিকার্য ব্যতীত তাহারা সাধারণ কৃষক-শ্রমিক হিসাবে নগদ মজুরীতে 'নামাল' খাটিতে যায়। অথবা কুলি হিসাবে অনেকে বাইরে গিয়া থাকে। বিশেষ ভাবে রেলষ্টেশনে, চা-বাগানে ইহাদের দেখায়। ইহাদের কৃষিকার্যের ধরন-ধারণ অন্যান্য কৃষিপ্রধান গোষ্ঠী হইতে পৃথক নয়। নানা উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান, ভুট্টা, গম, বিভিন্ন প্রকারের দাইল, সরিষা, আলু ও নানাপ্রকার শাকসব্জী হইল প্রধান। জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য জমিতে নিয়মিত সার দেয় কখনও বা পর্যায়ক্রমে চাষ করিয়া থাকে।

গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে গরু, মহিষ, কুকুর, বিড়াল, মুরগী, ছাগল, ভেড়া, হাঁস ও শূকরই হইলে প্রধান। গরু বা মহিষের দুগ্ধ পান করিতে ইহারা অভ্যস্ত। গাড়ীটানা, লাঙলকরা ইত্যাদি কাজে গরু বা মহিষ ব্যবহৃত হয়। শিকারের সময় কুকুর অত্যন্ত সাহায্য করিয়া থাকে। এখনও বৎসরে যে একবার প্রধান শিকার হয় তাহাতে তাহারা কুকুর লইয়া যায়। মুরগী বা শূকরের মাংস তাহারা খায়। তবে বিভিন্ন দেব-দেবী অথবা ভূত-প্রেতকে শান্ত করিবার জন্য মুরগী বলি দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

শিকার এককালে তাহাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল। গ্রামের পথে অথবা বিভিন্ন স্থানে সাঁওতালদের সর্বদা তীর-ধনুক লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যাইবে। নানারকমের পক্ষী, খরগোস, বন্য শূকর হইল প্রধান শিকারের বস্তু। শিকারের জন্য তাহাদের তীর-ধনুক, বাটুল (pellet), বর্শা বা সড়কি আছে। বাঁশের বাঁখারি দিয়া ও বাঁশের চাঁচ দিয়া ধনুক তৈয়ার করিয়া থাকে। তীরের ফলক হইল লোহার। তীরের শেষে পালক দেয়। ইহাতে তীর খুব সোজা ছুটিতে পারে। কখনওবা ফাঁদ পাতিয়া নানারকম পাখি ধরে। ইহা ছাড়া যুদ্ধবিগ্রহের জন্য অথবা কোন দূর পাল্লার যাত্রায় তাহারা এক রকমের লম্বা হাতল বিশিষ্ট টাঙি (Battle axe) ব্যবহার করিয়া থাকে।

দৈনন্দিন জীবন যাপনের একঘেঁয়েমির মধ্যেও ইহারা নানারকম শিকার করিয়া থাকে। প্রতিদিন খাওয়ার পরও যদি উদ্বৃত্ত হয় তবে ঐ মৎস্য তাহারা শুকাইয়া রাখে। মৎস্য ধরিবার জাল, দু' এক রকমের ঘুনি পলো জাতীয় খাঁচা আছে। বঁড়শীতে মাছ ধরাও তাহাদের নিকট নূতন নয়। ময়ূরভঞ্জের সাঁওতালদের তীর-ধনুক দিয়া মৎস্য শিকার করিতে দেখা গিয়াছে।

জংগলের কিনারে এখন যেসব সাঁওতাল বাস করিয়া থাকে তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদে এমন কোন আভিজাত্য দেখা যায়না। পুরুষেরা গামছা বা 'কৌপীন' জাতীয় ছোট কাপড় কোমরে জড়াইয়া রাখে। মেয়েরা দুইটি ছোট মোটা শাড়ী ব্যবহার করিত। ইহাকে

তাহারা 'পাঁড় হাঁড়' বলে। একখণ্ড কোমরে জড়ানো অপর খণ্ড বুকের উপর দিয়া পিঠের দিকে ফেলানো অবস্থায় থাকিত। বর্তমানে তাহাদের এই পুরাতন ধরনের পরিচ্ছদে আর দেখা যায় না। তাহারা ধুতি শাড়ী ও নানাবিধ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকে। নানারকম পুঁতির গহনা, পিতল বা কাঁসার গহনা হইল আগের দিনের আভরণ। বর্তমানে অনেকে সোনা বা রূপার গহনা ব্যবহার করে। খোঁপায় ফুল আটকাইয়া রাখা ইহাদের আর এক বৈশিষ্ট্য। অনেকে নানাভাবে উল্কি করিয়া থাকে।

অনেক নৃবিজ্ঞানীর ধারণা কৃষিজীবন আরম্ভ করিবার পূর্বে সাঁওতালরা শিকারজীবী গোষ্ঠী ছিল। কেননা নানা আচার-আচরণের মধ্যে তাহাদের সেই ভাবটি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এখনও তাহারা বার্ষিক শিকার-উৎসবের পূর্বে দেহেরী বা পুরোহিতের নেতৃত্বে 'সিং বোঙ্গা'র উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া থাকে। জংগলাকীর্ণ অঞ্চলে যে সমস্ত সাঁওতাল রহিয়াছে তাহারা পূর্বে বন্য প্রথায় চাষ করিত। শীতের শেষে জংগল পরিষ্কার করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইত। আর বর্ষার প্রারম্ভে তাহা কোপাইয়া ফসল বুনিত। এই জমি তিন চার বৎসরের বেশী উৎপাদনের কাজে লাগাইত না।

তাহারা কৃষির জন্য দুইরকমের জমি বাছিয়া লইয়া থাকে। একটি হইল বাড়ীর পাশাপাশি জমি অপরটি হইল দূরবর্তী আবাদী জমি। আবাদী জমিগুলি তাহারা মাঘ বা ফাল্গুন মাসে চষিয়া দেয়, সেই সব জমির আল, বাঁধ ঠিক করিয়া দেয় এবং গোময় ও অন্যান্য সার দিয়া জমির উর্বরতা বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া থাকে।

রোপা-চাষ (Transplantation) ও বুনা-চাষ (Broad casting) এই হইল দুই প্রকারের চাষ। প্রথমতঃ জমিতে উত্তমরূপে লাঙল দিয়া বীজধান্য বুনিয়া চারাগাছ বাহির হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকে। পরে বৃষ্টির পর যখন মাঠে জল জমিয়া যায় তখন ঐ চারাগাছ তাহাতে পুঁতিয়া দেয়। মধ্যে মধ্যে আগাছা পরিষ্কার করিয়া থাকে। আর গভীর জঙ্গলে জমি চষিবার পর

প্রথম বর্ষায় বীজধান ছড়াইয়া দেয়। পরে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে লাঙল দিয়া ঐ গাছগুলির গোড়া আলগা করিয়া দিয়া থাকে। আগছা উঠাইয়া জমিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার প্রয়াস পায়। ইহা ছাড়া আউস ধান অথবা জংলী ধরনের 'উড়ি' ধান চাষ করাও তাহাদের বৈশিষ্ট্য।

চাষের সময় পুরুষ ও স্ত্রী এক সংগে কাজ করিয়া থাকে। শীতের প্রথমে ফসল পাকিয়া গেলে তাহা কাটিয়া ফেলে। কখনও বা মাথায় করিয়া, কখনও বা বাঁকের সাহায্যে কাঁধে করিয়া শস্য বাড়ীতে উঠাইয়া আনে। বলদের সাহায্যে ধান মাড়াইর কাজ হয়। পরে কুলার বাতাসে ধানের ধুলা ও অনান্য ময়লা পরিষ্কার করিয়া, রোদে দিয়া খড়ের বিউনীর মধ্যে শস্য জমায়েত করিয়া থাকে।

পূর্বের দিনে এবং এখনও কোথাও কোথাও কাঠের হামালদিস্তায় ধান ভানা হয়। বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক পরিবারে একটি করিয়া ঢেঁকি রহিয়াছে। ইহা ছাড়া নানাবিধ বাসন-কোষন, ঝুড়ি ও গৃহস্থালীর নানাবিধ সরঞ্জাম রহিয়াছে।

কৃষিকার্যের জন্য তাহাদের নানাবিধ যন্ত্রপাতি রহিয়াছে। অনেক গ্রামে চাপদিয়া তেল তৈয়ার করিবার ঘানি অথবা মানুষটানা কাঠের ঘানি দেখিতে পাওয়া যায়।

সাঁওতালদের প্রধান খাদ্য হইল ভাত। ভাতের সংগে তরীতরকারী ও বাদ দেয়না। নানাবিধ উৎসবে তাহারা মদ খাইতে ভালবাসে। এখন তাহাদের সেই অভ্যাস অনেক কমিয়া গিয়াছে।

সাঁওতালদের সমাজগড়নে এমন কোন বৈচিত্র্য নাই। তাহাদের ধারণা 'পিলুচু হারাম' আর 'পিলুচুবুড়ী' এই দুইজন হইল সম্প্রদায়ের স্রষ্টা। তাহাদের সাতজন করিয়া পুত্রকন্যা হয়। তাহারা পারস্পরিক বিবাহে আবদ্ধ হইলে পর তাহাদের আবার সাতজন করিয়া পুত্র কন্যা হয়। সেই পূর্বপুরুষদের নাম ও গোত্র লইয়া সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে, পরে একই গোত্রে বিবাহ বাদ দেওয়া হয়। ইহাই হইল তাহাদের সমাজের উৎপত্তির রূপকথা। সেই সাতটি

গোত্র হইল : (১) হাঁসদা, (২) মুরমু, (৩) কিসকু, (৪) হেমরম, (৫) মাণ্ডি, (৬) সারেন ও (৭) টুডু। এইগুলিই তাহাদের পদবী বলিয়া বিবেচিত হয়। এই সাতটি প্রধান গোত্রের সহিত আরও পাঁচটি গোত্র দেখা যায়। তাহা হইল (১) বাস্কে, (২) পাউরিয়া, (৩) ব্যাসরা, (৪) চঁড়ে ও (৫) বডয়া। প্রত্যেক গোত্র বা কুলের একটি করিয়া গোত্রদেবতা আছে। ইহা ফুল বা পাখীর নামানুসারে হইয়াছে। যেমন হাঁসদা কুলের লোক হাঁসকে গোত্রদেবতা বলিয়া মনে করে। এই গোত্রের লোক কখনও হাঁস মারে না বা খায় না, আবার মুরমু গোত্রের লোকেরা কখনও চাঁপাফুল ছোঁয়না, ইত্যাদি। এই ভাবে গোত্রদেবতা (Totem)-কে তাহারা শ্রদ্ধা দেখায়। আবার কোন কোন গোত্রের উপবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। একই গোত্রে বা সগোত্রে বিবাহ হয় না। ইহাদের গোত্রগুলির আবার কৌলিক বৃত্তি ছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। যেমন সরেন গোত্রের লোকেরা সৈনিকের কাজ করিত। টুডু গোত্রের লোকজন লোহার জিনিসপত্র তৈয়ার করিত অথবা উৎসবে নাগরা-মাদল প্রভৃতি বাজাইত। ব্যাসকে গোত্রের লোকেরা বিনিময় প্রথায় ব্যবসা করিত, মুরমু গোত্রের লোকেরা পূজা-পদ্ধতিতে পুরোহিতের কাজ করিত।

তাহাদের সমাজে পরিবার হইল ক্ষুদ্র সংস্থা। পিতামাতা ও সন্তানসন্ততি লইয়া পরিবার। আবার অনেক সময় বহুপত্নী (Polygyny) লইয়া বৃহৎ পরিবারও দেখা যায়। কখনও বা পিতা ও তাহার বিবাহিত পুত্রদের লইয়া বিরাট একান্নবর্তী পরিবারে বাস করিয়া থাকে। কৃষিজীবী গোষ্ঠী বলিয়া কৃষিকার্যের জন্য এই ধরনের বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার থাকা খুবই সমীচীন।

সমাজ 'পিতৃপ্রধান' বা 'পিতৃকেন্দ্রিক' (Patriarchate) বলিয়া সর্ব বিষয়ে পুরুষদের কর্তৃত্ব দেখা যায়। বিষয়-সম্পত্তির মালিক হয় পুরুষেরা। পিতার মৃত্যুর পর পুত্ররা সম্পত্তির মালিক হয়। বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত কন্যারা তাহাদের পিত্রালয়ে থাকে।

ঐ সময় তাহারা কিছু সঞ্চয় করিয়া থাকিলে বিবাহের পর স্বামীর বাড়ী লইয়া যায়।

পরিণত বয়সে বিবাহ সাঁওতাল সমাজের একটি সংস্কার। আঠার হইতে বাইশ বৎসর বয়স হইলে পিতা-মাতা তাহাদের পুত্রের জন্য কন্যা ঠিক করিতে থাকে। আবার কোথাও স্থানীয় হিন্দুদের দেখা-দেখি কম বয়সে বিবাহও ঘটিয়া থাকে। সাঁওতালদের বিবাহের দুইটি প্রধান অনুষ্ঠান লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত বিবাহের পাত্রকে কন্যা পক্ষের লোক কোলে করিয়া লইয়া যায় আর বিবাহের সময় পাত্রকে কন্যার কপালে সিঁদুর দিতে হয়। বিবাহের পর বরকন্যা একত্র ভোজন করিয়া থাকে। ইহাদের বিবাহের কয়েকটি ধরনের হয়।

(১) সাদা বাপলা: এই বিবাহে বরকন্যার অভিভাবকগণ পরস্পরের বাড়ী গিয়া পাত্রপাত্রী পচ্ছন্দ করিয়া আসে। কখনও বা ঘটক বিবাহের কথাবার্তা পাকাপাকি করিয়া থাকে। এই ঘটককে 'রাইবর' বলা হয়। গ্রামের মাতব্বররা 'যগমাঁঝি' বরের সংগে কন্যার বাড়ীতে যায়। ইহারা অনেক সংস্কারে বিশ্বাস করে বলিয়া যাত্রার প্রাক্কালে শুভাশুভ লক্ষ্য করিয়া থাকে। কন্যার বাড়ীতে গেলে আনুষ্ঠানিক ভাবে কন্যা 'ধাগদত্তা' হয়। সেই সময় কন্যাকে কোলে বসাইতে হয় এবং বরের কর্তৃপক্ষ তাহাকে একটি হার বা 'হাঁসুলি' উপঢৌকন দেয়। বিবাহের দিন কন্যাপণ মিটাইয়া দিতে হয়। যগমাঁঝিকে গ্রামমান্য হিসাবে দুইটি টাকা দিতে হইত। এই রকমের বিবাহকে কখনও বা 'কিরিং বহু' বলা হইয়া থাকে।

(২) টুঙ্কি দিপিল: বিবাহের পুর্বে পাকা-দেখা ও আশীর্বাদী সবই পূর্বের মত হইয়া থাকে। ঘটক বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিয়া থাকে। এই বিবাহের অনুষ্ঠান কন্যার বাড়ীতে হয় না। কন্যাপণ ইত্যাদি সমূহ মিটাইয়া দেওয়ার পর বরের গ্রামের লোকজন বিশেষ করিরা গ্রামের মাতব্বর মাঁঝি বা যগমাঁঝি কন্যাকে আনিতে যায়। বরের বাড়ীতে বিবাহ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

(৩) অর-ইতুৎ ঃ এই বিবাহে বর ও কন্যা উভয়েই পরস্পরকে ভালবাসিয়া বিবাহের প্রস্তাব করে। বরের কর্তৃপক্ষ সাধারণতঃ রাজি থাকে কিন্তু কন্যার কর্তৃপক্ষ অনেক সময় রাজি থাকে না। ইতুৎ-এর অর্থ হইল কপালে সিন্দুর দেওয়া। বর কন্যার কপালে সিন্দুর দেয় এবং তাহার হাত ধরিয়া টান দেয়। গ্রামের যগমাঁঝি ব্যাপারটিকে সামলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। অনেক সময় কন্যাপক্ষের লোকজন বা গ্রামবাসী বরের এই প্রস্তাবে স্বীকৃতি জানায় না। তখন ভয়ানক ঝামেলা বাঁধে। অনেক সময় কন্যার বাড়ীর বা গ্রামের লোকজন বরের বাড়ী চড়াও হইয়া তাহাকে প্রহার দেয়, এমনকি তাহাকে অর্ধমৃত করিয়া ফেলে। শেষে গ্রামের যগমাঁঝি নিষ্পত্তি করিয়া দেয়। বরের কর্তৃপক্ষ দুইটি ভাল পাঁঠা অথবা শূকর দিলে প্রীতিভোজ অনুষ্ঠিত হয়। ইহার পর কন্যার পিতা পণের টাকা পণ হিসাবে পায়। বরের গ্রামের মাতব্বর পাঁচ টাকা পায়, কেন না সে বরের জীবন রক্ষায় সাহায্য করিয়াছে।

(৪) ঞিরবল ঃ এই রকম বিবাহ একটু অদ্ভুত ধরণের। প্রথমত কোন মেয়ে যদি কোন ছেলেকে ভালবাসে ও বিবাহের প্রস্তাব দেয় তাহাতে যদি ছেলের আপত্তি অথবা তাহার অভিভাবকের আপত্তি থাকে। তখন মেয়েটি গ্রামের যগমাঁঝিকে সমুদয় বৃত্তান্ত জানায়। যগমাঁঝি মেয়েটিকে বরের বাড়ী যাইবার নির্দেশ দেয়। সেই সময়ে মেয়েকে তাহার শ্বশুর বাড়ীর লোকজন নানাভাবে নির্যাতন করিতে পারে। পরে বিবাহের সমূহ খরচ বরপক্ষকে বহন করিতে হয়। বিবাহের পণ হিসাবে সাধারণতঃ বরপক্ষকে তিনটি শাড়ী, দুইটি গরু আর সাতটি টাকা দিতে হয়। ইহা ছাড়া প্রীতিভোজের ব্যয়ও পৃথক আছে।

(৫) টুঙ্কিকি দিপিল বাপলা ঃ যাহারা অত্যন্ত গরীব তাহারা এই ধরণের বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। বিবাহে এমন কোন অনুষ্ঠান নাই। মেয়ের কপালে সিন্দুর দেওয়া হয় এবং বরের বাড়ীতে এই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

(৬) **কিরিং যাওয়াল :** ইহা এক অদ্ভুত ধরনের বিবাহ। কোন কারণে অনূঢ়া কন্যা গর্ভবতী হইলে তাহার জন্য একটি পাত্র সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। কেন না তাহার ভাবী সন্তান মর্যাদা ও গোত্র পাইতে হইবে। ইহার জন্য পাত্র অনুসন্ধান কঠিন কাজ। যথেষ্ট অর্থব্যয় করিলে কোন কোন পাত্র তাহাতে রাজি হয়। হইার দ্বারা পাত্রকে পণ-টাকা দিতে হয়। কোন পাত্র না পাওয়া গেলে ভাবী-সন্তান যগমাঁঝির গোত্র ও কুল পাইয়া থাকে।

(৭) ঘরদিযাওয়াল বা গৃহজামাতা : এই রকমের বিবাহে বরকে কোন রকম পণ দিতে হয় না। সে ভাবী শশুরের বাড়ীতে কয়েক বৎসর থাকিলে পর শশুর তাহাকে উপযুক্ত উপঢৌকন ও তৈজস-পত্র দিয়া থাকে। অনেক সময় দেখা যায় এই বিবাহের কন্যাকে সকলে পছন্দ করে না।

(৮) সাংগা : বিধবা অথবা স্বামী পরিত্যক্তা মেয়ের সহিত বিবাহ করাকে সাংগা বলা হয়। ইহার জন্য ও বরপক্ষকে পণ দিতে হয়।

বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক : সাঁওতালদের বিবাহবন্ধনছেদের জন্য দুইটি প্রধান কারণ গণ্য করা হয়। প্রথমত যদি স্ত্রী বিশ্বাস-ঘাতিনী অথবা ডাইনী হয় তবে সাঁওতাল সমাজে সেই রকম স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার বিধান আছে। পূর্বের দিনে গ্রামের মাতব্বরদের নিকট তালাক দিতে হইত। উভয়পক্ষ শালপাতাকে ছিন্ন করিত ও জলপাত্র উল্টাইয়া দিত। যদি কোন পুরুষ বিনা কারণে তাহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে তবে সে তাহার পণ ফিরিয়া পায় না। সন্তান-গুলি সাধারণত পিতার নিকট থাকিয়া যায়। কেবল মাত্র শিশু সন্তানটি তাহার মাতার কাছে থাকে। ইহার জন্য সে পূর্বস্বামীর নিটক হইতে খরচ পায়। যদি বিবাহবিচ্ছেদে স্ত্রীর দোষ প্রমাণিত হয় তবে পুরুষ তাহার পণ ফিরিয়া পাইবার দাবী করে।

বড় ভাই মারা গেলে তাহার বিধবাকে ছোট ভাই বিবাহ করিয়া থাকে।

সাঁওতালদের জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুর সংগে বহু আচার-অনুষ্ঠান রহিয়াছে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর তীর দিয়া তাহার নাভিচ্ছেদ করা হয়। 'জানান ছাতিয়া' অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত জন্মাশৌচ থাকে। তিনদিন অশৌচের পর মুণ্ডন হইয়া থাকে। গ্রামের সমস্ত লোক ঐ বাড়িতে আসে। গৃহস্বামী উপস্থিত গ্রামবাসীকে তেল-হলুদ দিয়া স্নানের জন্য পাঠায়। ঐ সময় মেয়েদের নখকাটা ও পুরুষদের ক্ষৌরকর্ম করিতে হয়। যে তীর দিয়া নাভিচ্ছেদ করা হইয়াছিল সেই তীর, নবজাতকের মাথার চুল ও সুতা জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। পরে সুতাটি নবজাতকের কোমরে জড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহার পর 'জাতে তোলা' অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে নবজাতকের মাতাকে ছাঁচার নীচে বসিতে হয়। দাই আসন গাছের পাতা দিয়া গোবর জল গুলে গুলে মাতা ও নবজাতকের গায়ে নিক্ষেপ করিতে থাকে। এই অনুষ্ঠানের পর উপস্থিত গ্রামবাসীদের গায়ে হলুদ-জল নিক্ষেপ করিতে হয়।

ইহার পর নামকরণ অনুষ্ঠান হয়। ঠাকুরদাদার নাম অনুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামকরণ হয়। সাধারনতঃ পূর্বপুরুষদের নামানুসারে বংশধর-দের নামকরণ হইয়া থাকে। গৃহজামাতার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে মাতামহের নামানুসারে তাহার নামকরণ হইয়া থাকে। এই অনুষ্ঠানে প্রীতিভোজের আয়োজন থাকে।

সাঁওতালদের সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলা অত্যন্ত কঠোর ভাবে মানিতে হয়। কেহ অসামাজিক আচরণ করিলে অথবা নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিলে তাহাকে জাতিচ্যুত পর্যন্ত করা হয়। জাতিচ্যুত হওয়াকে 'বিটলাহা' বলা হয়। সাঁওতালদের সমাজ-কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় গ্রাম হইল একটি সংস্থা। গ্রামের প্রধানকে বা মাতব্বরকে 'মাঁঝি' বলা হয়। গ্রামের সর্বপ্রকার উৎসব অনুষ্ঠানে তাহাকে নেতৃত্ব করিতে হয়। মাঁঝির সম্মানের জন্য তাহাকে পূর্বে নিষ্কর জমি ব্যবহার করিতে দেওয়া হইত। বিশেষ উৎসবে বা শিকারে আহৃত প্রাণীর বিশেষ অংশ তাহার সম্মানের জন্য অর্পণ করা হইত। মাঁঝি যদি কোন কারণে গ্রামবাসীর বিশ্বাস হারায় তবে গ্রামের লোক তাহাকে বাদ দিয়া নূতন

মাঁঝি নির্বাচন করিতে পারে। অনেক সময় মাঁঝিকে 'প্রধান' বা 'মুস্তাফীর' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

মাঁঝির সহকারীকে 'পারানিক' বলা হয়। মাঁঝির অবর্তমানে পরানিক মাঁঝির কার্য করিয়া থাকে। পারানিক হইল মন্ত্রণাদাতা।

মাঁঝি বা প্রধানের সহকারী হইল 'যগমাঁঝি'। যগমাঁঝির আরও একটি সামাজিক কর্তব্য আছে। তাহার উপর গ্রামের অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের নৈতিক চরিত্র লক্ষ্য করার দায়িত্ব থাকে। গ্রামে অবৈধ প্রণয় না ঘটে অথবা অন্য কোন নিন্দার্হ ব্যাপার না ঘটিয়া থাকে তাহার জন্য যগমাঁঝিকে অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হয়। যদি কোন অবৈধ প্রণয়জনিত সন্তান সম্ভাবনা থাকে তখন দুষ্কৃতকারীদের অবিষ্কার করিতে হয়। যগমাঁঝি যদি অসমর্থ হয় অনেক সময় তাহাকে গোয়ালের দড়ি দিয়া বাঁধিয়া জরিমানা করা হয়। নবজাতক যগমাঁঝির বংশ ও কুল পাইয়া থাকে। গ্রামের নৃত্যগীতের আসরে যগমাঝিকে নেতৃত্ব করিতে হয়। যগমাঁঝির একজন সহকারী আছে তাহাকে যগপারানিক (সহকারী মন্ত্রণা দাতা) বলা হয়। ইহা ছাড়া ডাক হাকের জন্য একজন ব্যক্তি থাকে তাহাকে 'গোডেৎ' বলা হয়। মাঝির মৃত্যুর পর পারানিক মাঁঝি হইলে গোডেৎ পারানিকের পদ পায়।

মাঁঝির উর্ধতম মালিক হইল 'পরগণাইৎ'। অনেকগুলি গ্রাম লইয়া একটি পরগণা হইয়া থাকে। পরগণাইৎ এর নিকট বিভিন্ন গ্রামের নানা সুখসুবিধা ও অসাচ্ছন্দ্য, নিয়ম-শৃঙ্খলা ইত্যাদি অলোচিত হয়। এই আলোচনার সময় প্রত্যেক গ্রামের মাঁঝি বা প্রধানগণ সমবেত হইয়া থাকে। কোন কোন সময়ে মাঁঝির বিচারে কেহ সন্তুষ্ট না হইলে পরগণাইতের কাছে সুবিচার প্রার্থনা করিয়া থাকে। পরগণাইতের সহকারীর নাম 'দেশমাঁঝি'। পরগণাইত বৎসরে বিভিন্ন গ্রামের মাঁঝিদের নিকট হইতে ঘী, চাউল ইত্যাদি বার্ষিক উপঢৌকন হিসাবে পাইত। কোন কোন সময়ে পরগণাইতের বিচারে কেহ ক্ষুণ্ণ হইলে 'লবির' বিচার প্রার্থনা করে। সেদিন বিচার করে 'দেহুরী'। দেহুরী হইল বার্ষিক শিকার করার প্রধান আহ্বায়ক।

তাহার ডাকে গ্রামের সর্বস্তরের লোক উপস্থিত হইয়া থাকে। তখন শিকার করিবার দিন ও স্থান ধার্য করিয়া 'ঢারুওয়া' দেওয়া হয়। অর্থাৎ শালগাছের একটি ছাল এবং তাহার সংগে একটু শালগাছের ডালে গাঁট (গিরা) দেওয়া থাকে। সেই শাল ডাল দেখিয়া জনসাধারণ শিকার করিবার স্থান ও সময় বুঝিয়া থাকে। আবার জনতার নিকট দেহুরী বিচার করিয়া থাকে। সেই বিচার অত্যন্ত নির্ভুল হওয়া চাই। দেহুরীর বিচার বর্তমানের সুপ্রীমকোর্টের চূড়ান্ত রায়েব মত।

'নায়েকে' হইল সাঁওতাল সমাজের পুরোহিত। দেব-দেবীর পূজা, প্রেতশক্তির নিকট শান্তিকামনা ইত্যাদিতে নায়েকে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহাকে বলি বা উৎসরে কাজ করিতে হয়। নায়েকেকে সাহায্য করিবার জন্য কুডুম নায়েকে আছে। স্থানীয় ভূতপ্রেত শান্ত কবিতে হইলে কুডুম নায়েকে নিজ রক্ত উৎসর্গ করিয়া থাকে। শিকারের নিশ্চয়তার জন্য কুডুম নায়েকে নানারকম তুকতাক করিয়া থাকে।

হিন্দুদের মত সাঁওতালরা মৃত দেহ দাহ করিয়া সৎকার করিয়া থাকে। শবদাহের পূর্বে চিতার সংগে একটি মুরগী বাচ্চা আঁটিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তাহাদের ধারণা ঐ বাচ্চাটি মৃত ব্যক্তির আত্মাকে স্বর্গের পথে লইয়া যাইবে। মৃতদেহ সৎকারের পূর্বে তাহাকে নূতন কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়, তাহার মুখ হাত পা ইত্যাদি ধুইয়া দিতে হয়। মাথায় তেল-হলুদ অথবা সধবার বেলা সিন্দুর দিবার ব্যবস্থা আছে। অত্যন্ত গরীব লোকেরা কখনও কখনও মৃতদেহ কবর দেয়। সাঁওতালরা মৃতের দগ্ধাস্থি নদীতে বিসর্জন দিয়া থাকে। একটি মাটির ভাঁড়ে ঐ দগ্ধাস্থি রাখিয়া তাহার মুখ বন্ধ করা হয় কিন্তু একটি ছোট ছিদ্র রাখা হয়। তাহাদের ধারণা ঐ ছিদ্র পথে মৃতের আত্মা যাতায়াত করিবে। মৃতাশৌচের পাঁচদিনের দিন 'তেল নাহান' অর্থাৎ ছোট শ্রাদ্ধ হয়। ঐ সময় তেল, খইল, দাঁতন ইত্যাদি মৃতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। 'মারাং বুরু,' 'পুরুধুল' প্রভৃতির উদ্দেশ্যেও নিবেদন করা হয়। ঐ সময় মুরগী বলি হয় ও হাঁড়িয়া পুজা হয়। স্থানীয় নদীতে পরে অস্থি বিসর্জন করা হয়। মৃত আত্মাকে প্রণাম জানান

হয়। তাহাকে স্বর্গে দেবতার নিকট স্থান করিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করা হয়। আদি পিতা 'পিলচু হাড়াম' ও আদি মাতা 'পিলচু বুড়ী'র নিকট প্রার্থনা জানান হয়। ইহার পর 'ভাণ্ডান' তর্থাৎ বড় শ্রাদ্ধ হয়। তাহার আত্মীয়স্বজন মুরগী, ছাগল ইত্যাদি লইয়া আসে ও বিরাট প্রীতিভোজ হয় ঐ সংগে হাঁড়িয়ার (Rice beer) এর ব্যবস্থা হয়।

পূজা পার্বণ বা শ্রাদ্ধ-শান্তিতে মুরগী ও ছাগল বলি দেওয়া একটি প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান। নূতন ফল, বা ফসল পাইবার পর দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতে হয়।

সাঁওতালদের কতকগুলি গ্রাম্য পূজা হইল এরঃ শিম, হারিয়াড় শিম, নাওয়াই, জান্থাড়, মাহামড়ে ইত্যাদি। এর সিম পূজা হইল বীজবপনের পূজা, হারিয়াড় শিম পূজা হইল ধান রোপণের পূজা, এই সময় হইতে ধানগাছের পাতা সবুজ হইতে আরম্ভ করে। নাওয়াই হইল ভাদ্রমাসের পূজা ; ভুট্টা বা আউসধানের নবান্ন হয়। জান্থাড় হইল ধান পাকার পূজা। এই ভাবে কৃষিজীবী মানুষের গোষ্ঠী নানা দেবদেবীকে পূজা-অর্চনা করিয়া অনাবিল শান্তি ও জীবনযাত্রার নিশ্চয়তা কামনা করিয়া থাকে।

এই সমস্ত দেবদেবী ছাড়া তাহাদের প্রধান দেবতা হইল 'আরাং বুড়ু', 'জাহর এড়া' ও 'মঁড়েক'। মারাং বুড়ু পর্বতের দেবতা—সাঁওতাল-দের ঠিক পথে আসিবার নির্দেশ দিয়াছে। জাহর হইল প্রকৃতি আর মঁড়েক হইল পঞ্চশক্তি।

এই সব পূজা ছাড়া সাঁওতালদের কয়েকটি পরব আছে। সহরাই, বাহা, বা মহোমড়ে হইল প্রধান পরব। সাঁওতালদের মতে ফাল্গুন মাস হইল বৎসরের প্রথম দিন। শীতের দিনের রিক্তা ধরিত্রী নবপত্রে পুষ্পে সজ্জিত হইয়া নবরূপে প্রকাশ পায়। বন-জংগলে পর্বতগাত্রে সর্বত্র যেন এক প্রাণচাঞ্চল্য। ফাল্গুন মাসকে ইহারা 'বাহাবঙ্গা' বা ফুলের মাস বলিয়া থাকে। এই মাসে বাহা পরব হয়। শুক্লপক্ষের দ্বাদশী বা চতুর্দশী হইতে পরবের সূচনা—তিন দিন অথবা পাঁচদিন ধরিয়া চালিতে থাকে। সেই পরবের পর

নূতন শাকসব্জী ভক্ষণ আরম্ভ হয়। ঐ সময় সাঁওতাল পল্লীতে পল্লীতে মাদলের শব্দে, বাঁশীর গুঞ্জরণে, শিঙ্গার তূর্যধ্বনিতে প্রাণ-প্রাচুর্যের উন্মাদনা আসে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, শাল-মহুয়া ফুলের মাতাল বাতাস ইহাদের দেহমনে ঝংকার আনে। যুবকযুবতীরা নৃত্যগীতের মাধ্যমে তাহাদের সেই মনের ভাবকে প্রকাশ করে।

একটি গান :—চাঁদোয় মোলাঃ এন হো মনে নাওয়ায়েন,
বুরুকো আরোঃ আহো রাঃস্কা সাগেণঃ
হয়ে হিসিদা হো জিওয়ি চার হোঃ ॥
কুহু কুহু রাঃ হো দাড়ে সাহারঃ
তিরিয় তরুরু হো দিল বাহারঃ
বাহা মহেঃ অহো আশ ঞেলঃ ॥
বাহা মহেঃ আহো রমজ সারিঃ
বিবচ এনেচ্ আহো সহাগ চাপেঃ আ
চাঁদোয় কুনামিঃ হো দিশম সের্মাঃ আ ॥

অর্থাৎ—‘পূর্ণিমায় চাঁদ প্রাণে নূতন জোয়ার নিয়ে এল
পাহাড় পর্বত নূতন সাজে সজ্জিত হ’ল,
মৃদুমন্দ মলয় সমীরণে প্রাণমুকুলিত হল,’
কুহুধ্বনি ও বংশীধ্বনি প্রাণে নূতন বল ও উদ্দীপনা সঞ্চার করল
ফুলের কুঁড়ির সাথে নূতন আশার কুঁড়িদেখতে পায়,
ফুল ফুটে উঠে, আনন্দ সত্য হয়ে ওঠে,
পূর্ণ চন্দ্রের বিকিরণে বনজঙ্গল উল্লাসে নৃত্য করছে,
ধরাধামে যেন স্বর্গ নেমে এসেছে।’

সোহরাই পরব পৌষ মাসে হইয়া থাকে। আগে আশ্বিন মাসে হইয়া থাকিত। এই পরব পাঁচদিন ধরিয়া চলে। সোহরাই পরব গরুকে কেন্দ্র করিয়া উৎসব। গোয়ালঘরে গরুর পূজা ও পরে নৃত্যগীত মদোম্মত্ততার মাধ্যমে গরুকে নাচান এই পরবের বৈশিষ্ট্য। এই সময় যগমাঝির বাড়ীতে প্রীতিভোজ হইয়া থাকে। এইভাবে তাহারা সংস্কৃতিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। বর্তমানে শিক্ষাদীক্ষাও প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতেছে।